রবীন্দ্রসাহিত্য-পরিচিতি

রবীন্দ্রসাহিত্য-পরিচিতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক, ঔপন্যাসিক ও
'রবিরশ্মি' প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থপ্রণেতা
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্তৃক লিখিত

বোস মুখার্জ্জি এণ্ড কোং
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
২৬, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীকমলকৃষ্ণ বসু
বোস মুখার্জ্জি এণ্ড কোং
২৬, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

মূল্য দেড় টাকা

মুদ্রাকর—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
এম. আই. প্রেস, ৩০, গ্রে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

পূর্বাভাষ

গ্রন্থকার স্বর্গীয় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন আমার বাল্যবন্ধু। তাঁহার শেষ দিন পর্যন্ত এই বন্ধুত্ব উত্তরোত্তর পুষ্ট হইতে পুষ্টতর হইয়া চলিতেছিল। তাঁহার পরিচয় প্রদান অনাবশ্যক। বঙ্গসাহিত্যে, বিশেষত রবীন্দ্রসাহিত্যে অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠা অধিকার করিয়া তিনি নিজের পরিচয় নিজেই পরিপূর্ণ ভাবে দিয়া গিয়াছেন। যাহারা রবীন্দ্ররচনার গভীর আলোচনা করিয়াছেন চারুচন্দ্রের নাম তাঁহাদের মধ্যে অতি গৌরবের সহিত উল্লেখ করিতে হইবে। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রসাহিত্যের যথার্থ মার্মিক ও রসজ্ঞ। তিনি নিজেই বলিয়াছেন "কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাব্য আমার জীবনযাত্রার সহচর। সুখে সহানুভূতি, দুঃখে সান্ত্বনা, সম্পদে উপদেশ বিপদে আশ্বাস জোগাইয়া এই কাব্য আমার ......অন্তরকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে।" মার্মিক ও রসজ্ঞ হইবার জন্য যে একান্ত নিষ্ঠা ও দীর্ঘ সাধনা আবশ্যক, চারুচন্দ্রের তাহা ছিল, এবং তিনি তাহার ফলও লাভ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রসাহিত্যের সৌন্দর্য ও রস-

গ্রহণে কীরূপে অন্যকে সাহায্য করিতে পারা যায় তিনি তাহা সবিশেষ জানিতেন, এবং কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত র বি র শ্মি নামে দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ এক বৃহৎ পুস্তক লিখিয়া তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি জীবনের শেস পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্য আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং সেই সম্বন্ধে নানা সন্দর্ভ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার কতক তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হইয়াছিল, কতক হয় নাই। যে সব হয় নাই তাহাদেরই কয়টি, তাঁহার পরলোক গমনের পর আজ তাঁহার অন্যতম পুত্র, পিতারই ন্যায় বঙ্গসাহিত্যের সেবানিষ্ঠ শ্রীমান্ কনক বন্দ্যোপাধ্যায় একত্র সংগ্রহ করিয়া র বী ন্দ্র সা হি ত্য - প রি চি তি নামে আমাদিগকে উপহার দিতেছেন। র বি র শ্মি র সহিত ইহার অনেক সাম্য থাকিলেও একটি বৈষম্য আছে। প্রথমখানিতে এক একটি কবিতা বা কাব্য পৃথক্-পৃথক্ ধরিয়া নানাদিক্ দিয়া সমালোচনার কৌশলে তাহার সৌন্দর্য বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় খানিতে অনেক নিবন্ধে বহু কবিতা বা কাব্যকে ফুলের মত গ্রহণ করিয়া ঐগুলির দ্বারা এক-এক সূত্রে এক-একখানি এমন অখণ্ড

মাল্য রচনা করা হইয়াছে যাহা সহজেই পাঠকের হৃদয় হরণ করিতে পারে। 'ভাবুক' পাঠকগণ ইহা পাঠ করিয়া যে তৃপ্তি লাভ করিবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

হরিশ্চন্দ্রপুর,
১৮ই আশ্বিন, ১৩৪৯ সাল

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

প্রকাশকের নিবেদন

'রবীন্দ্রসাহিত্য-পরিচিতি'র মধ্যে যে কয়টি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে 'যোগাযোগ' ও 'শেষের কবিতা' সম্বন্ধীয় আলোচনা দুইটি কয়েক বৎসর পূর্বে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। অন্য সকল প্রবন্ধই অপ্রকাশিত অবস্থায় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধ্যাপনার টীকা-টিপ্পনীর অঙ্গীভূত হইয়াছিল। সেগুলি সংগৃহীত হইয়া এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাদিগকে উপকৃত ও কৃতজ্ঞ করিয়াছেন। তাঁহার ভূমিকা গ্রন্থখানির মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে।

গ্রন্থখানির মুদ্রণকার্যে প্রুফ প্রভৃতি দেখিয়া দিয়া চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত কনক বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ, আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ও লেখকের যে ছবিখানি এই গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে উহাও তাঁহার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

বিষয় নির্দেশ

সংশোধনী

৩০ পৃষ্ঠায় 'বধু' স্থানে 'বঁধু',

৪৬ পৃষ্ঠায় 'পর্ণ' স্থানে 'পূর্ণ',

৭৬ পৃষ্ঠায় 'জবননেবতা' স্থানে 'জীবনদেবতা' পড়িবেন।

৪৬ পৃষ্ঠার শেষ অনুচ্ছেদ—"সমস্ত মানবসম্বন্ধের বিকার হইতে... ৪৭ পৃষ্ঠার পাদপদ্ম স্থাপিত" পর্যন্ত পংক্তি কয়টি অজিতকুমার চক্রবর্তীর রচনা হইতে উদ্ধৃত ; সুতরাং উহা বন্ধনীর ("...") মধ্যে হইবে।

লেখক ও রবীন্দ্রনাথ

১৯১১ সালে কবির পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে গৃহীত একখানি ফটোগ্রাফ হইতে

রবীন্দ্রসাহিত্য-পরিচিতি

কাব্যের স্বরূপ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাব্য আমার জীবন-যাত্রায় নিত্য সহচর। সুখে সহানুভূতি, দুঃখে সান্ত্বনা, সম্পদে উপদেশ, বিপদে আশ্বাস জোগাইয়া এই কাব্য আমার প্রাণে দিনে দিনে যে নব নব ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছে, সুখস্বপ্নের আবেশের মত যে মাদকরসে আমার অন্তরকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ আজ আমি পরিবেশন করিব। কবির অফুরন্ত ভাবভাণ্ডার হইতে আমার ব্যক্তিগত রুচির প্ররোচনায় আমি যাহা সঞ্চয় করিয়াছি, তাহারই এক কণা বিতরণ করিয়া দেখাইব কবির ভাণ্ডার অনন্ত রসমাধুর্যে পরিপূর্ণ, ঐশ্বর্যে অদ্বিতীয়, অথচ ভোগে দানে সার্থক। আমার এই প্রবন্ধ মহাসমুদ্রের একাংশের চিত্রদর্শন মাত্র, ইহার মধ্যে সমগ্র কবিহৃদয়ের সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটিত হইবে, ইহা কেহ আশা করিবেন না। রবিজ্যোতিকে মৃৎপ্রদীপ জ্বালাইয়া লোকলোচনের গোচর করিবার প্রয়াসের তুল্য আমার এই প্রয়াস।

স্বর্গীয় মোহিতচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

"যাহা যথার্থ কবিতা, দিব্য কল্পনা যাহাকে জন্ম দিয়াছে, অকৃত্রিম ছন্দ-সৌন্দর্য তাহাকে বাহিরে ভূষিত করে এবং ভাবের গভীরতা তাহাকে অন্তরে পরিপূর্ণ করিয়া থাকে। তাহার আনন্দ কল্যাণকে আবাহন করে, এবং সৌন্দর্যে তাহা জগতের নিত্যসুন্দর অনির্বচনীয় পদার্থসমূহের সমতুল হয়। সাধারণভাবে সংক্ষেপে সঙ্কেতস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, যে কবিতা অনির্বচনীয়তায় সঙ্গীতের যত সদৃশ এবং যে কবিতায় পাঠক মানবজীবনের প্রসারতা যত অধিক অনুভব করেন, তাহা তত শ্রেষ্ঠ। যিনি কথার সাহায্যে একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করেন তিনি কবি; কিন্তু উচ্চতর কবি তিনি, যিনি শুধু চিত্রাঙ্কণে পরিতুষ্ট না হইয়া তাঁহার ছন্দের মর্মে মর্মে সঙ্গীতের অপূর্ব অপরূপ ঝঙ্কারগুলি আনিতে পারেন। যিনি জীবনের একটি সামান্যতম সত্যকে পরিস্ফুট ও সুন্দর করিয়া তুলিতে পারেন তিনি কবি; কিন্তু উচ্চতর কবি তিনি, যাঁহার কবিতায় সমগ্র জীবনের সুগম্ভীর বিজয়গীতি শ্রুত হয়। যিনি সত্য ও ছন্দের সাহায্যে পাঠকের মনে আনন্দ সৃজন করেন তিনি কবি, কিন্তু উচ্চতর কবি তিনি,—যাঁহার নিজের আনন্দ এত স্বাভাবিক ও যথেষ্ট যে পাঠক কণামাত্র আস্বাদন করিয়া বুঝিতে পারেন, আমি আগন্তুক মাত্র, আমার অপেক্ষা কবির নয়ন অশ্রুতে অধিক সমাকীর্ণ; আমার অপেক্ষা কবির হাস্য আনন্দে অধিক উদ্ভাসিত।"

উচ্চতর কবির এই সমস্ত লক্ষণই আমরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ভূরি পরিমাণে যথেচ্ছ দৃকপাতে দেখিতে পাই। আমরা প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের যে-সমস্ত পদ ও শ্লোক উদ্ধৃত করিব

তাহাতেই সপ্রমাণ হইবে, কবির কাব্য ছন্দের ঝঙ্কারে কি অপূর্ব সুললিত—তাহা যেন সঙ্গীতের আবেশে আপনা আপনি গলিয়া পড়িতেছে। তাহা রসে মাধুর্যে অনির্বচনীয়।

কিন্তু আমরা যে রবীন্দ্রনাথের জন্য উচ্চতম কবির সিংহাসন দাবি করিতেছি, সে কোন্ লক্ষণে নির্ভর করিয়া। আমাদের মনে হয় উচ্চতম কবি তিনি,—যাঁহার কাব্য অতিমাত্র ব্যাপক, যাহা নিজে শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্। যাহার শিক্ষা—নাল্পে সুখমস্তি, যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্। যাহা বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবের সহিত একাত্ম, যাহার মধ্যে জগতের নাড়ীস্পন্দন স্পষ্ট অনুভূত হয়, যাহা সামান্যতা পরিহার করিয়া ভূমানন্দের অন্তরঙ্গ আত্মীয়রূপে প্রকাশিত হইয়া উঠে, যাহা মানবের মনকে আমিত্ব পরিহার করিয়া বিশ্বের দিকে প্রসারিত করিয়া দেয়, যাহা বিশ্বের ভিতর দিয়া মানব-মনকে বিশ্বেশ্বরের চরণপদ্মের অভিমুখীন করে। ইহা ভারতবর্ষের একান্ত নিজস্ব সাধনা, এবং এই লক্ষণটি আমরা কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাব্যেই অত্যন্ত পরিস্ফুট দেখিতে পাই।

বিখ্যাত ফরাশী সমালোচক স্যাঁৎ বিউবও প্রকারান্তরে এই কথাই বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর, প্রকৃতি, প্রতিভা, কলাচাতুর্য, প্রেম ও মানবজীবন—প্রধানত এই ছয়টি শ্রেষ্ঠ কবিতার মূল উপাদান।

বিশ্বকাব্যের অনাদি কবির লীলায় আমরা দেখিতে পাই Ethereal-কে Tangible-এর মধ্যে, Spirit-কে Matter-এর মধ্যে, অসীমকে সীমার মধ্যে ধরিয়া প্রকাশ করা। শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যও সেই বিশ্বকাব্যেরই প্রতিধ্বনি।—

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া,
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা চায় হ'তে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

এইরূপ প্রকাশ শুধু গীতি-কবিতাতেই সম্ভবপর। তাহাতে মানব-মনের সকল কালের ও সকল অবস্থার চিত্র পরিস্ফুট করিয়া তোলা যায়। পরন্তু মহাকাব্য ঘটনা-বিশেষকে অবলম্বন ও কেন্দ্র করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে, তাহার মধ্যে সমগ্রতা, বিশ্বজনীনতা ধরা দিতে পারে না। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্য রচনা করিতে পারেন নাই। অনেকে এজন্য ক্ষুণ্ণ। তিনি কৌতুকের সুর মিলাইয়া ইহার যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন তাহার মধ্যে যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে। কবি তাঁহার 'মানসী' প্রেয়সীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

তোমার তরে সবাই মোরে
করছে দোষী।
হে প্রেয়সী।

আমি নাব্‌ব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে।
ঠেক্‌ল কখন তোমার কাঁকণ-
কিঙ্কিণীতে,
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়!

* * * *

হায় রে কোথা যুদ্ধকথা
হৈল গত
স্বপ্নমত!
পুরাণ-চিত্র বীর-চরিত্র
অষ্ট সর্গ,
কৈল খণ্ড তোমার চণ্ড
নয়ন-খড়্গ!
রৈল মাত্র দিবা রাত্র
প্রেমের প্রলাপ,
দিলেম ফেলে ভাবী কেলে
কীর্তি-কলাপ!

জগৎবাসীর সৌভাগ্যক্রমেই কবিপ্রিয়ার কনক-স্পর্শে হাজার গীতে কল্পনাটি ফাটিয়া পড়িয়াছে, নয়ন-খড়্গে প্রেমের প্রলাপের বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেছে। এই প্রেম সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবকে বুকে করিয়া ভূমার দিকে পরম আনন্দে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে।

কবির এই প্রেমের মধ্যে কেহ কেহ পার্থিব ভাব দেখিয়া চমকাইয়া উঠেন। আমাদের মনে হয়, সে ভাব না থাকিলেই কবির প্রতিভা অসম্পূর্ণ হইত। কবি মিল্টন কল্পনা করিয়াছিলেন যে সোনার শিকল দিয়া স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্য বাঁধা আছে। আমাদের কবিও স্বর্গকে মর্ত্যের সঙ্গে বাঁধিয়াছেন এবং সোনার শিকল দিয়াই বাঁধিয়াছেন। মানুষ ভগবানের প্রেমকে উপলব্ধি করিতে পারে আপনার অন্তরে মানবীয় প্রেমকে উপলব্ধি করিয়া। আমরা মানব হইয়া মানবের মধ্যে জন্মিয়াছি, মানবের পরিচয়ের মধ্য দিয়াই পরমের পরিচয় পাওয়া ছাড়া আমাদের আর উপায় নাই। সেই জন্য কবির মনোবীণার সাতটি তারই বাজিয়া সম্পূর্ণ সঙ্গীতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে; যদি কোনোটি তার না বাজিত, তবে সঙ্গীতই হইত না। কবির অন্তর-বীণার মূর্চ্ছনায় লোহার তারটিও যেমন বাজিয়াছে, সোনার তারটিও তেমনি—কিন্তু তাই বলিয়া লোহার তারে সুর স্বতন্ত্র প্রধান হইয়া নাই, সে সকল সুরে সুর মিলাইয়া পরিপূর্ণ সঙ্গীতে

আত্মবিলোপ করিয়াছে। আর যদি তাহা না করিত, তবে কবির বীণা বেসুর বাজিত, সঙ্গীত হইত না।

যদিও কবি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

জড়িয়ে গেছে সরু মোটা দুটো তারে।
জীবন-বীণা ঠিক সুরে তাই বাজে নারে!
এই বেসুরো জটিলতায়
পরাণ আমার মরে ব্যথায়,
হঠাৎ আমার গান থেমে যায়
বারে বারে।
জীবন-বীণা ঠিক সুরে আর বাজে না রে!

কিন্তু এই বেসুর, পরিপূর্ণ প্রেমের অতৃপ্তির বেসুর। সর্বস্ব দিয়াও আরো দিবার আকাঙ্ক্ষা গভীর প্রণয়কে সর্বদাই অতৃপ্তিতে ভরিয়া রাখে। এই যে গভীর প্রেম, ইহা মানবীয় প্রেমেরই পরিণতি।

'বৈষ্ণব কবিতা' নামক কবিতায় কবি এই কথা স্পষ্ট করিয়াছেন—

সত্য ক'রে কহ মোরে, হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেম-ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেম-গান
বিরহ-তাপিত? হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে?

তার পর নিজেই তাহার উত্তর দিয়া বলিতেছেন যে, 'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান' নহে।—

আমাদেরি কুটীর-কাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা চরণে,
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ! এই প্রেমগীতিহার
গাঁথা হয় নরনারী-মিলন-মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে! আর পাব কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা!

কবির প্রতিভার সাধনা (mission) এই—মানবের সহিত পরমের সংযোগ-সাধন। যখন কবি নিজের শক্তি ও মাধুর্য নিজে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বলিতেছেন—

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম,
কস্তুরী মৃগ সম!

যখন পর্যন্ত তাঁহার প্রতিভা উদ্দেশ্য খুঁজিয়া না পাইয়া যেন—

কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হ'য়ে
কাঁদিছে আপন মনে,
কুসুমের দলে বন্ধ হ'য়ে
করুণ কাতর স্বনে!

তখনো তাঁহার মন হইতে অভয়বাণী উচ্চারিত হইয়াছে—

ভয় নাই তোর ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
কিছু নাই তোর ভাবনা।

যে শুভ-প্রভাতে সকলের সাথে
মিলিবি পূরাবি কামনা,
আপন অর্থ সে দিন বুঝিবি,
জীবন ব্যর্থ যাবে না !

এইরূপে জগতের সঙ্গে মিলিত হইয়া—'জগৎস্রোতে' ভাসিয়া চলাই তাঁহার জীবনের একমাত্র কামনা। 'শৈশব সঙ্গীতেও' কবি বলিয়াছেন—

জগৎ হ'য়ে রব আমি, একেলা রহিব না !
মরিয়া যাব একা হ'লে একটি জলকণা।
আমার নাহি সুখ দুখ, পরের পানে চাই,
যাহার পানে চেয়ে দেখি তাহাই হ'য়ে যাই।
তপন ভাসে তারা ভাসে আমিও যাই ভেসে,
তাদের গানে আমার গান, যেতেছি এক দেশে !
প্রভাত সাথে মুদি আঁখি, তারার সাথে গাই,
তারার সাথে উঠি আমি তারার সাথে যাই,
ফুলের সাথে ফুটি আমি, লতার সাথে নাচি,
বায়ুর সাথে ঘুরি শুধু ফুলের কাছাকাছি !
মায়ের প্রাণে স্নেহ হ'য়ে শিশুর পানে ধাই,
দুখীর সাথে কাঁদি আমি, সুখীর সাথে গাই,
সবার সাথে আছি আমি, আমার সাথে নাই,
জগৎস্রোতে দিবা নিশি ভাসিয়া চলে যাই !

এইরূপে কবি উপলব্ধি করিয়াছেন সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি তাঁহারই মধ্যে বিধৃত—

সবে মোর প্রাণ ভরি' প্রকাশে !

কবির অনেক কবিতার মধ্য হইতেই অদ্বৈতবাদের এই সুরটি বাজিয়া উঠিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতির মতো বিশ্বমানবও তাঁহাতে। তাই কবি বলিয়াছেন—

ইচ্ছা করে আপনার করি
যেখানে যা-কিছু আছে; নদীস্রোতোনীরে
আপনারে গলাইয়া দুই তীরে তীরে
নব নব লোকালয়ে ক'রে যাই দান
পিপাসার জল, গেয়ে যাই কলগান
দিবসে নিশীথে। পৃথিবীর মাঝখানে
উদয়-সমুদ্র-হ'তে অস্ত-সিন্ধুপানে
প্রসারিয়া আপনারে তুঙ্গগিরিরাজি
আপনার সুদুর্গম রহস্যে বিরাজি।
কঠিন পাষাণ-ক্রোড়ে তীব্র হিমবায়ে
মানুষ করিয়া তুলি লুকায়ে লুকায়ে
নব নব জাতি। ইচ্ছা করে মনে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোকসনে
দেশে-দেশান্তরে।

কবির মধ্যে এই বিশ্বজনীনতার ভাব থাকাতে কবি সর্বপ্রকার বন্ধন ও সংকীর্ণতার বিরোধী। তাঁহার প্রবল সাধ—

অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা—
নাহি কোনো ধর্মাধর্ম, নাহি কোনো প্রথা
নাহি কোনো বাধাবন্ধ,—নাহি চিন্তাজ্বর,
নাহি কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, নাহি ঘর-পর,

* * *

নৃত্য ক'রে চলে যায় আবেগে উল্লাসি,
উচ্ছৃঙ্খল সে জীবন, সেও ভালবাসি!
কতবার ইচ্ছা করে সেই প্রাণ-ঝড়ে
ছুটিয়া চলিয়া যাই পূর্ণ পালভরে।
মানবজীবন-রসে যত আছে স্বাদ
ইচ্ছা করে বার বার মিটাইতে সাধ
পান করি' বিশ্বের সকল পাত্র হ'তে
আনন্দ-মদিরাধারা নব নব স্রোতে!

এই কথাই তিনি 'মাতাল' কবিতার মধ্যে বিচিত্র লীলার সঙ্গে বলিয়াছেন। সকল সংস্কার সকল প্রথা সকল বন্ধন দূর করিয়া প্রমুক্ত স্বাধীনভাবে নিজেকে উপলব্ধি করিবার এইরূপ উদগ্র বাসনা সুফি কবিদিগের ও আমেরিকার কবি হুইট্‌ম্যানের রচনায়ও দেখা যায়। ইহাঁরা বলেন প্রকৃতি ও মানব লইয়া জগৎ। সমস্ত মানব-পরিবার দেশকালে অখণ্ড ও তাহা শাশ্বত। শাশ্বত সত্যের উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে আপনাকে অখণ্ড মানব-পরিবারের অন্তর্গত বলিয়া উপলব্ধি করা যায় না। যিনি নিজেকে শাশ্বত সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন তিনি সকলের পরমাত্মীয়। তিনিই বলিতে পারেন—

পাড়ায় যত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি এক-বয়সী জেনো।

এবং সমস্ত বিশ্বই তাঁহার ঘর—

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া!

দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া!
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া!

এবং তিনি,—

কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হ'য়ে

যে কর্ম করেন তাহা সকলের জন্য—

বলেছি যে-কথা করেছি যে-কাজ
আমার সে নয় সবার সে আজ,
ফিরিছে ভ্রমিয়া সংসার মাঝ
বিবিধ সাজে!

এইখানেই রবীন্দ্রনাথের প্রধান বিশেষত্ব! তিনি প্রাণের মধ্যে সকলের সঙ্গে আত্মীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন। এই জন্য সুখী দুঃখী, বালক বৃদ্ধ যুবা, নর নারী, ধনী দরিদ্র, ধার্মিক পাপী, স্বধর্মী বিধর্মী, স্বদেশী বিদেশী—সকলেই তাঁহার কাব্যে সমাদৃত এবং এইজন্য সকলেই নিজের নিজের হৃদয়ের কথাটি রবীন্দ্র-কাব্যে পরিব্যক্ত দেখিয়া আনন্দিত হইতে পারেন। যে যখন যে-কথাটি বলিতে চাহিয়াছে তাহার হইয়া কবি আগে থাকিতেই সেই কথাটি ছন্দে ও ভাবসৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়া বলিয়া রাখিয়াছেন—

তোমাদের চোখে আঁখিজল ঝরে যবে
আমি তাহাদের গেঁথে দিই গীতরবে,

লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি কবে
সুরের ভিতরে লুকাইয়া কহি তাহারে।

'উৎসবে' কবির বাঁশি যেমন আনন্দরাগে বাজিয়াছে, ব্যসনেও তেমনি করুণসুরে গলিয়া কাঁদিয়াছে। কিন্তু কবি প্রধানত সুখবাদী (Optimist) বলিয়া সকল দুঃখের মধ্যেই পরম কল্যাণ ও আনন্দের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। তাঁহার জীবনের মন্ত্র—

আনন্দই উপাসনা আনন্দময়ের।

এজন্য যে হতভাগ্য প্রণয়ে ব্যর্থ, ধনে বঞ্চিত, সমাজে নিগৃহীত, সেও কবির কাছ হইতে সান্ত্বনা লাভে বঞ্চিত নহে।

আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল,
ভবের পদ্মপত্রে জল সদা কর্‌চি টলমল!

আমরাও কবির আশ্বাসবাণীতে আশ্বস্ত হইয়া পরম দুঃখের মধ্যেও আনন্দের কারণ দেখিয়া,—

হাস্য মুখে অদৃষ্টেরে কর্‌ব মোরা পরিহাস!

কবির কাছে প্রেমের অর্থ পূজা, সম্ভোগ নহে—

যারে বলে ভালবাসা তারে বলে পূজা!

'বিজয়িনী' নারীর সম্মুখে—

ভূমি পরে
জানু পাতি' বসি', নির্বাক বিস্ময়ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি'।

এমন কি পতিতা রমণীর প্রণয়ও কবির কাছে উপেক্ষার সামগ্রী নহে। যেদিন অকস্মাৎ পতিতার প্রাণে প্রেমের সঞ্চার হইল সে দিন—

আনন্দে মোর দেবতা জাগিল,
জাগে আনন্দ ভকত-প্রাণে।

সে দিন তাহার কলুষিত অন্তরকে পবিত্র করিয়া—

নিমেষে ধৌত নির্মল রূপে
বাহিরিয়া এল কুমারী নারী।

তখন দেখিতে দেখিতে—

জননীর স্নেহ, রমণীর দয়া,
কুমারীর নব-নীরব-প্রীতি,
আমার হৃদয়-বীণার তন্ত্রে
জাগায়ে তুলিল মিলিত-গীতি।

প্রকৃত একনিষ্ঠ প্রণয় পতিতাকেও পবিত্র করে,—দেবতা করে। 'তোমার হাতের পূজার ফুল' পাইয়া সে দেবী হইয়া উঠে।

মানবজগতে সবই গতিশীল, ঘূর্ণীর পাকে প্রমত্ত। কেবল,

স্থির আছে শুধু একটি বিন্দু
ঘূর্ণীর মাঝখানে।

সেই স্থির বিন্দুটি প্রেম।

হে প্রেম, হে ধ্রুব সুন্দর!
স্থিরতার নীড় তুমি রচিয়াছ
ঘর্ণার পাকে খরতর।

সেই প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন স্বর্ণকমলের শতদলে ভুবনলক্ষ্মী।

সেইখান হ'তে স্বর্ণকমল
উঠেছে শূন্য পানে!
সুন্দরী ওগো সুন্দরী!
শতদল-দলে ভুবনলক্ষ্মী
দাঁড়ায়ে রয়েছ মরি মরি!
জগতের পাকে সকলি ঘুরিছে
অচল তোমার রূপরাশি!
নানা দিক হ'তে নানা দিন দেখি,—
পাই দেখিবারে ঐ হাসি!

ভুবনলক্ষ্মীর প্রেমলীলা মানবে মানবে, মানবে জড়ে, মানবে পশুতে কবির কাছে শতেকপ্রকারে উদ্ভাসিত। 'সামান্য লোকের' অসামান্যতা, পশ্চিমী মজুরের ছোট মেয়ে 'দিদির' স্নেহ, 'মূঢ় পশু ভাষাহীন নির্বাক হৃদয়'—তাহাদেরও প্রতি 'মানবের স্নেহের কৌতুক'—সমস্তই কবির কাছে বৃহৎভাবে ধরা দিয়াছে। শকুন্তলার পতিগৃহ-যাত্রাকালে জড়চেতনের কাছে বিদায়গ্রহণ; সুরলক্ষ্মীর 'স্বর্গ হইতে বিদায়'; বিদেশ যাত্রাকালে চারি বৎসরের কন্যাটির 'যেতে নাহি দিব',—কবির প্রাণে অপূর্ব প্রেম-বেদনার সঙ্গীত রচনা করিয়াছে। 'পুরাতন ভৃত্যে'র প্রভুভক্তি, জন্মভিটা 'দুই বিঘা জমি'র প্রতি অনুরাগ, স্বদেশের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম বিচিত্র রসে অনুপ্রাণিত। কবির কাছে স্বদেশ

'ভুবনমনোমোহিনী' রূপে দেখা দিয়াছেন, ভারতকে তিনি মহা-মানবের মিলনক্ষেত্র বলিয়া মানিয়াছেন, কাহাকেও তিনি বিদেশী বলিয়া অবহেলা করেন নাই—অথচ দেশী বা বিদেশী যেখানে যখন যে অন্যায় করিয়াছে সেখানে কবি নির্মম নিয়তির মতো আঘাত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

অপরপক্ষে ভুবনলক্ষ্মীর অনন্ত প্রণয়লীলা যখন প্রকৃতির মধ্যে প্রকাশিত, যখন—

ভ্রমর ফিরেছে মাধবীকুঞ্জে, তরুরে ঘিরিছে লতা
চাঁদেরে চাহিয়া চকোরী উড়েছে, তড়িৎ খেলেছে মেঘে
সাগর কোথায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া তটিনী ছুটেছে বেগে,
ভোরের গগনে অরুণ উঠিতে কমল মেলেছে আঁখি,
নবীন আষাঢ় যেমনি এসেছে চাতক উঠেছে ডাকি'।
এত যে গোপন মনের মিলন ভুবনে ভুবনে আছে—

তখন সে সমস্তই কবির চক্ষে ধরা পড়িয়াছে; শ্যামগম্ভীরা নববর্ষার আষাঢ়ের মেঘময়ী বেণী যখন এলাইয়া পড়ে তখন,

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচেরে
হৃদয় নাচেরে!

উন্মাদ মধুনিশিতে, আলো-ঝলমল শিশিরঢালা শরতে, রুদ্রভৈরব বৈশাখে, বাধা-বন্ধহারা ঝড়ের দিনে, জ্যোতির্ময়ী জ্যোৎস্না-রাত্রে, বালুকা-শয়নপাতা নদীতে, আদিজননী

সিন্ধুতে, দেবতাত্মা পর্বতে, প্রশান্ত প্রান্তরে—সর্বত্র এবং সর্বকালে কবি প্রকৃতির অপরূপ প্রকাশ দেখিয়া বিমুগ্ধ!

"মাকে মা বলিয়া সন্তান যেমন সার্থক হয়, প্রকৃতিকে সুন্দর বলিয়া কবি তেমনি আপনার কবিতাকে সার্থক করিয়াছেন।"

তাঁহার কাছে—

"প্রসন্ন আকাশ হাসিছে বন্ধুর মত।"
"সন্ধ্যা-অন্ধকার মায়ের অঞ্চল সম।"

আবার সৌন্দর্যের অতিরিক্ত যে বস্তু-নিরপেক্ষ (Absolute) সৌন্দর্য তাহাও কবির দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। এই সৌন্দর্যকে কবি নারী-রূপেই দেখিয়াছেন। কিন্তু তাহা ভোগাতীত, প্রয়োজনাতিরিক্ত, অনির্বচনীয়—

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী!

এই উর্বশীরূপিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মী 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি' উঠে। তাহার প্রকাশ—

ডান হাতে সুধা পাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে।

তাহারই নৃত্যলীলায়—

ছন্দে ছন্দে নাচি' উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি' উঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হ'তে নভস্তলে খসি' পড়ে তারা
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা।

এই যে অনির্বচনীয় বস্তুনিরপেক্ষ সৌন্দর্য, যাহা কাহারও কোনো কিছুতেই কাজে লাগে না, তাহাকেই কিন্তু সমস্ত জগৎ সর্ব স্বার্থ বলি দিয়া পূজা করিতেছে। সেই সৌন্দর্য-লক্ষ্মীকেই মানব পাইবার জন্য আর্তনাদ করিতেছে—

জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা,
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকসিত বিশ্ব-বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার।
অখিল মানসস্বর্গে অনন্ত রঙ্গিণী,
হে স্বপ্ন-সঙ্গিনী।

কিন্তু প্রতিদিবসই আমরা মিথ্যা প্রলোভনে বিভ্রান্ত হইতেছি। সুন্দর বলিয়া পদে পদে অসুন্দরকে ধরিয়া ভুল করিতেছি। তখন বুঝিতে পারি—

যাহা পাই তাহা ভুল করে চাই,
যাহা চাই তাহা পাইনে।

সুন্দরকে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করিবার এই যে অনন্ত বাসনা তাহা যেন 'বিরহিণী'। তাহার যে কিসের বিরহ ঠিক পাই না। তাহার নিকটে আমি নিজেকে নিঃশেষে দান করি।—কিন্তু হায়—

রমণীরে কেবা জানে—
মন তার কোন্ খানে?

যখনই তাহার ভাবগতিক দেখিয়া—

মনে হ'ল, সুখে প্রসন্ন মুখে
চাহিল সে মোর পানে।

ঠিক তখনই সেই নিষ্ঠুরা অতৃপ্তিকাতর কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল—

তোমাতে আমার কোন সুখ নেই,
কহে বিরহিণী নারী।

তখন বুঝিলাম আপনাকে লইয়া মজিয়া থাকাই পরমার্থ নহে, তাহাতে পরিতৃপ্তি লাভ হয় না। তখন—

বাহিরে আনিনু তাহারে, করিতে
হৃদয় দিগ্বিজয়।
সারথি হইয়া রথখানি তার
চালানু ধরণীময়।
দিকে দিকে লোক সঁপি দিল প্রাণ,
দিকে দিকে তার উঠে চাটুগান,
মনে হ'ল তবে দীপ্তগরবে
চাহিল সে মোর পানে।

কিন্তু হায়রে আমার অদৃষ্ট! তখনই—

হৃদয় কুড়ায়ে কোনো সুখ নাই—
কহে বিরহিণী নারী।

মানবের ভালোবাসা প্রশংসাতেও ত কৈ চিত্ত ভরিল না! আমার অন্তরবাসিনী বিরহিণীর অতৃপ্ত আবদারে অস্থির হইয়া—

আমি কহিলাম—কারে তুমি চাও,
ওগো বিরহিণী নারী।
সে কহিল—আমি যারে চাই তার
নাম না কহিতে পারি।

একি বিপদ! যাহার নাম রূপ পরিচয় কিছু জানি না, তাহাকে কোথায় খুঁজিয়া পাইব? কিন্তু না খুঁজিলেও ত নয়—

দিন চলে যায়, সে কেবল হায়,
ফেলে নয়নের বারি।
অজানারে কবে আপন করিব—
কহে বিরহিণী নারী।

সেই অজানা বন্ধুর নামরূপ আমরা জানি না বটে, কিন্তু যে বিরহিণী নারী,

সে কহিল—আমি যারে চাই তারে
পলকে যদিগো পাই দেখিবারে,
পুলকে তখনই লব তারে চিনি'
চাহি' তার মুখপানে।

সেই অজানা 'অতিথি' কবির প্রাণের দ্বারে রিণিঠিনি শিকলটি নাড়িয়া যেই সাড়া দিয়াছেন কবি অমনি তাঁহাকে চিনিয়া গায়ত্রীমন্ত্রের মতো অন্তরে বাহিরে দেখিয়াছেন। বাহিরে তিনি—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী!

অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল-কাননে,
দ্যুলোকে ভুলোকে বিলসিছ চল-চরণে
তুমি চঞ্চল-গামিনী!

* * * *

কত না বর্ণে কত না স্বর্ণে গঠিত
কত যে ছন্দে কত সঙ্গীতে রটিত,
কত না গ্রন্থে কত না কণ্ঠে পঠিত,
তব অসংখ্য কাহিনী।

আবার তিনিই—

অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী!

অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি,
একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি,
নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মূরতি,
তুমি অচপল দামিনী।

বাহিরে যিনি বিচিত্র চঞ্চল, অন্তরে তিনিই এক অচপল। অন্তরের প্রশান্ত একই বাহিরের বিচিত্ররূপিণী।

ইনি 'পসারিণী' বেশে আমাদের কাছে যাতায়াত করেন। পসারিণী 'কোথা কোন্ বহুদূরে বিদেশের রাজপুরে' রতনের হাটে বিকিকিনি করিতে চলিয়াছে! আজ এই নিস্তব্ধ নির্জন দ্বিপ্রহরে—

সম্মুখে দেখো ত চাহি' পথের যে সীমা নাহি,
তপ্তবালু অগ্নিবাণ হানে।

এখন আমি নিশ্চিন্ত নীরবে একাকী কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম করিতেছি—

হেথা দেখো শাখা-ঢাকা বাঁধা বটতল ;
কূলে কূলে ভরা দীঘি, কাকচক্ষুজল।
থাক্ তব বিকিকিনি ওগো শ্রান্ত পসারিণী,
এইখানে বিছাও অঞ্চল।

তুমি রতনের হাটে যে পসরা লইয়া চলিয়াছ তাহা আমার কাছে নামাইয়া আমায় একবার দেখাইয়া যাও। ওগো প্রত্যক্ষ, ওগো Immediate, তুমি পরোক্ষের সংবাদ, Infinity-র তত্ত্ব আমাকে বলিয়া যাও। তারপর আবার যখন কর্মপ্রবাহ জাগ্রত হইয়া উঠিবে,—

দুগ্ধ দোহনের রবে কোকিল জাগিবে যবে,
আপনি জাগায়ে দিব কালি।

তখন তুমি অনন্ত পথে যাত্রা করিয়ো। তুমি ত চিরদিন একস্থানে বন্দিনী থাকিবার লোক নও! তুমি অসীম, তুমি অশান্ত, তুমি অনন্ত পথের যাত্রী। যাবার পথে আমার হৃদয়—

ছুঁয়ে যায় নুয়ে যায় রে,
ফুল ফুটিয়ে যায় শত শত।

বিশ্রামের সময় তোমাকে যেমন করিয়া কাছে পাইব কর্ম জাগ্রত হইলে তোমায় আর তেমন করিয়া পাইব না।

'কর্ম' বড় কড়া মনিব। একটু ত্রুটি পাইলেই রোষভরে তিরস্কার করে। তাহার ভৃত্য—

কহিল গদগদ স্বরে কালি রাত্রি দ্বিপ্রহরে
মারা গেছে মোর ছোট মেয়ে!

তথাপি নিস্তার নাই। সেই সদ্য-শোক বুকে বহিয়া—

প্রতি দিবসের মত ঘষামাজা মোছা কত,
কোনো কর্ম রহিল না বাকি!

অতএব এই অবকাশে তোমাকে একটু বুঝিয়া লইতে দাও। কিন্তু শুধু বুদ্ধিতে পাইয়া ত অন্তরের পিপাসা মিটিতেছে না। বার বার শুধু মনে হয়—

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই
চিরদিন কেন পাই না!

তখন অতৃপ্ত হৃদয় লইয়া—

ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর।

অভ্যাস ও সংস্কারের দাস আমরা, মণি হাতে পাইয়াও চিনি না। না বুঝিয়া—

কখন ফেলেছে ছুঁড়ে পরশ-পাথর।

তখন নিরাশাক্লান্ত অবসন্ন প্রাণে সকল 'ব্যর্থ সাধনরাশি' পথে ফেলিয়া—

সন্ন্যাসী আবার ধীরে পূর্বপথে যায় ফিরে'
খুঁজিতে নূতন ক'রে হারানো রতন।

অর্ধেক জীবন খুঁজি' কোন্ ক্ষণে চক্ষু বুজি'
স্পর্শ লভেছিল যার এক পল ভর,
বাকি অর্ধভগ্ন প্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ-পাথর।

আমাদের জীবনে এমনি করিয়া কত সুবিধা আমাদেরই খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়ায়। আমাকেই খুঁজিতে আসিয়া আমাকেই—

শুধাল কাতরে—সে কোথায়, সে কোথায়!
ব্যগ্রচরণে আমারি দুয়ারে নামি'।
সরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়,
নবীন পথিক সে যে আমি, সেই আমি!

কিন্তু যখন সে সুবিধা চলিয়া যায় তখন তাহারই উদ্দেশে—

ত্রিযামা যামিনী একা ব'সে গান গাহি,
হতাশ পথিক, সে যে আমি, সেই আমি!

ক্ষণিকের মিলন আমরা জীবনে সার্থক করিয়া তুলিতে পারি না বলিয়া নিবিড় ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় লাভের জন্য আমাদের অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠে। তখন এই প্রার্থনা ধ্বনিত হইতে থাকে—

তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো!
তোমারি আসন হৃদয়-পদ্মে
রাজে যেন সদা রাজে গো!

এখন কবি আপনার জীবনটিকে 'নৈবেদ্য'-রূপে হৃদয়-দেবতার সম্মুখে সাজাইয়া ধরিয়াছেন। এখন তাঁহার নিবেদনের আনন্দ। পাওয়ার আনন্দ এখনো তিনি পান নাই। কত বেদনা নিবেদনের পর একদিন জীবনদেবতার 'চিঠি' আসিল—

না জানি কারে দেখিয়াছি,
দেখেছি কার মুখ,
প্রভাতে আজ পেয়েছি তার চিঠি।
পেয়েছি এই সুখে আছি,
পেয়েছি এই সুখ,
কারেও আমি দেখাব না তো সেটি!

কিন্তু হায়! আমি নিরক্ষর মূর্খ! আমার হৃদয়ানন্দ আমাকে যে কি সংবাদ পাঠাইয়াছেন, তাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।

লিখন আমি নাহি জানি,
বুঝি না কি যে আছে বাণী,
যা আছে থাক্ আমারি থাক্ তাহা।
পেয়েছি এই সুখে আজি,
পবনে উঠে বেণু বাজি
পেয়েছি-সুখে পরাণ গাহে আহা!

পাড়া প্রতিবাসীরা পরামর্শ দিতেছে—তুই পণ্ডিতের কাছে লইয়া গিয়া চিঠিখানা পড়াইয়া আয়।—

পণ্ডিত সে কোথা আছে,
শুনেছি নাকি তিনি
পড়িয়া দেন লিখন নানামত।
যাব না আমি তাঁর কাছে,
তাঁহারে নাহি চিনি,
থাকুন ল'য়ে পুরাণো পুঁথি যত।

আমার প্রেমাস্পদের কথা আমি বুঝিতে পারি, অপরে তাহা কি বুঝিবে? পণ্ডিত নিজের মতো করিয়া বুঝিয়া আমাকে যাহা বুঝাইবেন তাহা ত পণ্ডিতের নিজের কথা, আমার প্রেমাস্পদের কথা নহে। আমার গুরু আমি নিজেই হইব, অন্য গুরুঠাকুরের দরকার নাই। গুরুঠাকুরের,—

শুনিয়া কথা পাব না দিশে,
বুঝেন কি না বুঝিব কিসে,
ধন্দ ল'য়ে পড়িব মহা গোলে।
তাহার চেয়ে এ লিপিখানি
মাথায় কভু রাখিব আনি',
যতনে কভু তুলিব ধরি' কোলে।

আমার চিঠিতে আমার হৃদয়ানন্দের বাণী আছে এইটুকু অনুভব করিয়াই আমি ধন্য হইব। সেই অনুভূতিতেই সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিতে সেই বাণী প্রতিধ্বনিত শুনিব।

না-বোঝা মোর লিপিখানি,
প্রাণের বোঝা দিল টানি',
সকল গানে লাগায়ে দিল সুর।

কবি ব্রাউনিঙ্‌ও তাঁহার Lover God-এর নিকট হইতে এমনি একখানি না-বুঝা লিপি পাইয়াছিলেন। না-বুঝা লিপি পাইয়া মন অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। তখন বারবার বলিতেছি—

প্রেমের দূতকে পাঠাবে নাথ কবে?
সকল দ্বন্দ্ব ঘুচ্‌বে আমার তবে।

যে যাহাকে ভালোবাসে সেও শুধু 'না-বুঝা লিপি' পাঠাইয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। হঠাৎ দেখি—

পাঠালে আজি মৃত্যুর দূত
আমার ঘরের দ্বারে,
তব আহ্বান করি' সে বহন
পার হ'য়ে এল পারে।

দূতের মূর্তি দেখিয়া প্রথমে বড় ভয় লাগিল, কিন্তু সে আমারই প্রিয়তমের দূত বলিয়া চোখের জল মুছিয়া দূতকে বরণ করিয়া ঘরে লইলাম। তখন দেখিলাম, সে ত শুধু দূত নয়, সেই ত আমার প্রিয়তম। বিরাট রুদ্ররূপে সাজিয়া আসিয়াছেন! তিনি তাঁহার প্রণয়িণীকে হরণ করিতে চুপি চুপি হৃদিতলে অবতরণ করিলেন। এখন—

প্রথম মিলন-ভীতি ভেঙেছে বধূর
তোমার বিরাট-মূর্তি নিরখি' মধুর!

রুদ্রবেশী মহাদেব তাঁহার গৌরীকে বিবাহ করিতে আসিতেছেন—

তাঁর ববম্ববম্ বাজে গাল
দোলে গলায় কপালাভরণ,
তাঁর বিষাণে ফুকারি' উঠে তান,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ !
শুনি শ্মশানবাসীর কলকল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ !
সুখে গৌরীর আঁখি ছলছল,
তাঁর কাঁপিছে নিচোলাবরণ।
তাঁর বাম আঁখি স্ফুরে থরথর,
তাঁর হিয়া দুরুদুরু দুলিছে,
তাঁর পুলকিত তনু জরজর,
তাঁর মন আপনারে ভুলিছে।

যাহাদের অন্তরের মিল হইয়া গেছে তাহারা বাহিরের রূপ দেখিয়া ভ্রান্ত হয় না। তাই রুদ্রবেশী প্রিয়তমকে দেখিয়াও প্রণয়িণীর আঁখি সুখে ছলছল। কিন্তু যাহারা ঠিক তেমন করিয়া চিনে না তাহারা ভয়ানককে সমাদর করিতে পারে না।—

তাঁর মাতা কাঁদে শিরে হানি' কর
ক্ষ্যাপা বরেরে করিতে বরণ,
তাঁর পিতা মনে মানে পরমাদ,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

মৃত্যুকে কবি এমনি আত্মীয়রূপেই চিনিয়াছেন। জীবন মৃত্যু দুই-ই কবির কাছে বিশ্বেশ্বরের কোল।

ডান হাত হ'তে বাম হাতে লও
বাম হাত হ'তে ডানে।
নিজ ধন তুমি নিজেই হরিয়া
কি যে কর কেবা জানে!

কিন্তু তাঁহার কোল হইতে কিছুই বিনষ্ট হয় না ইহা নিশ্চিত!

হারায়নি কিছু ফুরায়নি কিছু,
যে মরিল যেবা বাঁচিল।

কিন্তু মানুষ অজ্ঞাতকে বড় ভয় করে, তাই চির-পরিচিত জীবন ছাড়িয়া অজ্ঞাত 'মৃত্যুর মাধুরী' উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু—

স্তন হ'তে তুলে নিলে শিশু কাঁদে ডরে,
মূহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।

জীবনদেবতা তাঁহার প্রণয়িণীর কাছে আসিলেন। প্রণয়িণী তাঁহাকে আবাহন করিবার জন্য 'খেয়া'-র 'সোনার তরী' সাজাইয়া 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। কিন্তু তখনো এই সংসারের দিকে চাহিয়া এক একবার মনে হইতেছে—

জানিনে আজ ফির্‌ব কিনা,
কার সাথে আজ হবে চিনা,
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা তরণীতে।

তবু আজ কি আনন্দ! কি উৎসব!

রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখ পথে!

তাঁহার স্বর্ণশিখর রথের চাকার ঝনঝন শোনা গেছে। দেখা গেল—

প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার
স্বর্ণশিখর রথে।

তখন বধূ ভাবিতেছে—

আমার গোধূলি-লগন এল বুঝি কাছে
গোধূলি-লগন রে!
বিবাহের রঙে রাঙা হ'য়ে আসে
সোনার গগন রে!

দেখিতে দেখিতে বর—সেই বিরাট পুরুষ বিবাহের উৎসবের মধ্যে বিচিত্র সাজে সাজিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বধূ তাঁহাকে বলিতেছেন—

ওগো বর, ওগো বধু,
এই যে নবীনা বুদ্ধিবিহীনা
এ তব বালিকা বধু।

আমি বুদ্ধিবিহীনা বালিকা; তোমার মর্যাদা আমি জানি না, তোমার প্রতি আমার প্রেম এখনো প্রগাঢ় হয় নাই। তোমার মধুসঙ্গ অপেক্ষা আমার সংসারের ধূলাখেলা পুতুলখেলা এখনো ভালো লাগে। কিন্তু 'হে মোর বন্ধু, হৃদয়বন্ধু মোর,' তোমার কি ধৈর্য, তোমার কি প্রেম, তোমার কি করুণা—তাহা আমি ব্যক্ত করিতে পারি না!

রতন আসন তুমি এরি তরে
রেখেছ সাজায়ে নির্জন ঘরে,

সোনার পাত্রে ভরিয়া রেখেছ নন্দনবন-মধু,—
ওগো বর, ওগো বঁধু।

কিন্তু আমারও প্রাণ একদিন তোমার প্রেম-পরশমণির স্পর্শ পাইয়া সোনা হইয়া উঠিবে—

এক দিন এর খেলা ঘুচে যাবে
ওই তব শ্রীচরণে।

তখন সে—

সাজিয়া যতনে তোমারি লাগিয়া
বাতায়নতলে রহিবে জাগিয়া,
শতযুগ করি' মানিবে তখন
ক্ষণেক অদর্শনে।

আমার এ আশা দুরাশা নহে।

এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন
আসিবে সে দিন আসিবে।

তোমার সকল দানই অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে। আমরা জানিতেই পারি না—

হে মোর পরাণবঁধু হে
কখন যে তুমি দিয়ে চলে যাও
পরাণে পরশমধু হে।

কিন্তু তোমার স্পর্শলাভমাত্রেই দেখি—

এক রজনীর বরষণে শুধু
কেমন ক'রে
আমার ঘরের সরোবর আজি
উঠেছে ভ'রে।

হের হের মোর আকুল অশ্রু-
সাগর মাঝে,
আজি এ অমল- কমল-কান্তি
কেমনে রাজে।

এই 'দুখযামিনীর বুক-চেরা-ধন' দেখিয়া তখন আর কোথাও কিছু শূন্য থাকে না, দৈন্য থাকে না, আকাঙ্ক্ষা থাকে না। তখন 'সব পেয়েছির দেশে' গিয়া ভূমানন্দে পরিপূর্ণ প্রাণে অন্তরতম বন্ধুকে অন্তরে পাইয়া শুধু বলিতে পারি—

আজ ত্রিভুবন-জোড়া কাহার বক্ষে
দেহ-মন মোর ফুরালো, যেন রে
নিঃশেষে আজি ফুরালো।
আজ যেখানে যা হেরি সকলেরি মাঝে
জুড়ালো জীবন জুড়ালো, আমার
আদি ও অন্ত জুড়ালো।

কিন্তু আপনার আদি ও অন্ত দান করিয়াও মনে হয় 'জীবনদেবতা'র প্রেমের বুঝি যথার্থ প্রতিদান হইল না; তাই বার বার শুধাইতে হয়—

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম।

আমার সর্বস্ব দিয়াও যেমন দেওয়ার শেষ হয় না,

তেমনি অনন্তকে পাইয়াও ত পাওয়া শেষ হয় না। পাওয়াতেই চাওয়া নিঃশেষ হইয়া যায় না।

শেষের মধ্যে অশেষ আছে
এই কথাটি মনে
আজ্‌কে আমার গানের শেষে
জাগ্‌ছে ক্ষণে ক্ষণে।

সুর গিয়েছে থেমে তবু
থাম্‌তে যেন চায় না কভু,
নীরবতায় বাজ্‌চে বীণা
বিনা প্রয়োজনে।

এই বিনা-প্রয়োজনের বীণাধ্বনির শেষ কোথায় মানব খুঁজিয়া পায় না, তাই তার শেষ কথাটি আর কিছুতেই শেষ হয় না। কবি ব্রাউনিঙ্‌ও One Word More বলিয়া শেষ কথাটিকে শেষ করিতে পারেন নাই।—

মনে হয় কি একটি শেষ কথা আছে,
সে কথা হইলে বলা সব শেষ হয়।
কল্পনা কাঁদিয়া ফিরে তারি পাছে পাছে,
তারি তরে চেয়ে আছে সমস্ত হৃদয়।

যখন সে কথাটি কিছুতেই বলিয়া শেষ করা যায় না, তখন অবাক হইয়া—

অবশেষে বলি শুধু চক্ষে লয়ে বারি,
হে চিরসুন্দর! আমি যাই বলিহারি!

সৃজনীপ্রতিভা

সকল স্রষ্টার সৃজনীপ্রতিভা যে ভাবে ক্রমবিকাশ লাভ করে, রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশও সেই ভাবেই হইয়াছে। প্রথম যৌবনে অন্তর্গূঢ় প্রতিভার বিকাশ-বেদনা তাঁহাকে আকুল করিয়াছে—তখন 'কুঁড়ির ভিতর কেঁদেছে গন্ধ আকুল হ'য়ে', তখন 'কস্তুরীমৃগ সম' কবি আপন গন্ধে পাগল হইয়া বনে বনে ফিরিয়াছেন। প্রথম জীবনের রচনায় এই আকুলতার বাণী, আশার বাণী, উৎকণ্ঠা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সঙ্কল্প, ক্ষণিকনৈরাশ্যে আত্মসান্ত্বনা, মহাসাগরের ডাক, বাধাবিঘ্নের সহিত সংগ্রাম ইত্যাদির কথা আছে।

কিন্তু একদিন এক শুভমুহূর্তে কবির হৃদয়-দুয়ার অকস্মাৎ খুলিয়া গেল,—

> হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি'
> জগৎ আসি' সেথা করিছে কোলাকুলি।

তখন অবারিত দ্বারে বিশ্বের সকল সৌন্দর্য কবির অন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল, কবির যৌবনস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে বিশ্বের চন্দ্রসূর্য হইতে পার্থিব রজঃ পর্যন্ত মধুমৎ প্রতিপন্ন হইল,—কবির যেন নব দৃষ্টির দ্বিজত্ব প্রাপ্তি ঘটিল—সদ্যসঞ্জীবিত অহল্যার মতো সেই দৃষ্টি বিশ্বের সৌন্দর্যের পানে তাকাইয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। এ সৌন্দর্যবোধ সম্পূর্ণ

ঐন্দ্রিয়িক (Sensuous), কিন্তু ইহাতে চিত্তে সৃষ্টির উপকরণ পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল। বহিঃপ্রকৃতি কবিকে সস্নেহে আহ্বান করিল, কবি প্রীতিতে বিগলিত হইলেন,—কবি বুঝিলেন—

জলে স্থলে আমি হাজার বাঁধনে বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে!

প্রকৃতির সহিত কবির জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ, নতুবা এমন নিবিড় পরিচয় হইল কেমন করিয়া?—

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের, তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনী দিন
যুগযুগান্ত ধরি'...........

—বসুন্ধরা

অন্যত্র—

আমি পৃথিবীর শিশু ব'সে আছি তব উপকূলে,
শুনিতেছি ধ্বনি তব। ভাবিতেছি, বুঝা যায় যেন
কিছু কিছু মর্ম তার, বোবার ইঙ্গিত ভাষা হেন
আত্মীয়ের কাছে। মনে হয় অন্তরের মাঝখানে
নাড়িতে যে রক্ত বহে, সেও যেন ওই ভাষা জানে,
আর কিছু শেখে নাই। মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীন ভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবন-ভ্রূণমাঝে, লক্ষকোটি বর্ষ ধরে

ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে। সেই পূর্ব জন্মের স্মরণ,
গর্ভস্থ পৃথিবী 'পরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের, অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি' নত
বসি' জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি
দিক হ'তে দিগন্তরে যুগ হ'তে যুগান্তরে গণি।

* * * *

প্রাণভরা ভাষাহারা দিশাহারা সেই আশা নিয়ে
চেয়ে আছি তোমা পানে। তুমি সিন্ধু, প্রকাণ্ড হাসিয়ে
টানিয়া নিতেছ যেন মহাবেগে কী নাড়ীর টানে
আমার এ মর্মখানি তোমার তরঙ্গমাঝখানে
কোলের শিশুর মত।

—সমুদ্রের প্রতি

এবং

তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা লুটায় আমার সামনে,
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া কেন যে, কব তা কেমনে।
মনে হয় যেন সে ধুলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণ জলে,
সে দুয়ার খুলি' কবে কোন্ ছলে বাহির হয়েছি ভ্রমণে।
সেই মূক মাটি মোর মুখ চেয়ে লুটায় আমার সামনে॥

নিশার আকাশ কেমন করিয়া তাকায় আমার পানে সে,
লক্ষ যোজন দূরের তারকা মোর নাম যেন জানে সে।

যে ভাষায় তারা করে কানাকানি
সাধ্য কি আর মনে তাহা আনি,
চির দিবসের ভুলে যাওয়া বাণী কোন্ কথা মনে আনে সে।
অনাদি উষার বন্ধু আমার তাকায় আমার পানে সে॥

বিশাল বিশ্বে চারিদিক হ'তে প্রতি কণা মোরে টানিছে।
আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ শত কোটি কর হানিছে।
ওরে মাটি, তুই আমারে কি চাস্,
মোর তরে জল দুহাত বাড়াস,
নিঃশ্বাসে বুকে পশিয়া বাতাস চির অহ্বান আনিছে।
পর ভাবি যারে তারা বারে বারে সবাই আমারে টানিছে॥

—প্রবাসী

কবির অন্তরে মাধুরীর উৎস খুলিয়া গিয়াছে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত এইরূপ নিবিড় পরিচয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে। তখন হইতে তাঁহার মনের কারখানায় রসরূপ সৃষ্টির উপাদান আহৃত হইয়াছে। কবি 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' নব নব রূপরস গড়িয়াছেন—গড়িবার জন্য তাঁহাকে অনেক কিছু ভাঙিতেও হইয়াছে। প্রথম প্রথম কবি পরের দেওয়া ছাঁচে গড়িতে গিয়াছিলেন—সে ছাঁচের নমুনা বাল্যরচনার মধ্যে বিহারীলাল প্রবর্তিত ছন্দ, আর 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। কিন্তু শীঘ্রই কবি নিজেই নিজের সৃষ্টির ছাঁচ গড়িয়াছেন—মানব-সংসারের তুচ্ছতম জিনিসটি পর্যন্ত তাহাতে বাদ পড়ে নাই, বিশ্বপ্রকৃতির সকল বৈচিত্র্য সমাহৃত হইয়া

কবির হাতে নূতন রূপে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। তৃণাঙ্কুর ধূলিকণা শিশিরকণাটি পর্যন্ত নব নব শ্রী ও সম্পদ লাভ করিয়াছে। কবি পাঠকের মনেও সৃজনী-মাধুরীর প্রত্যাশা করিয়া তাঁহার সৃষ্টিকে ব্যঞ্জনাময়ী করিয়াছেন—ছবির আদ্‌রা আঁকিয়া কবি পাঠককে দিয়াছেন তাহার নিজের মনের রং দিয়া ভরিবার জন্য, কবি সোনার তরী গড়িয়াছেন পাঠকেরা তাহাদের চিত্তক্ষেত্রের সোনার ধানের মাধুরী দিয়া উহা ভরিয়া তুলিবে এই ভরসায়।

বিধাতার সৃষ্টি নারীকে কবি তাঁহার মনের ঐশ্বর্যে নূতন করিয়া গড়িয়াছেন নিজস্ব ছাঁচে। তাঁহার কাব্যে নারী স্বপ্ন-সঙ্গিনী মর্মের গেহিনী হইয়াছে—মানসী হইয়াছে—বিজয়িনী হইয়াছে—তীর্থবারি বহন করিয়া নারী কল্যাণী হইয়াছে—পতিতাও মহীয়সী হইয়াছে—নারী হইয়াছে 'অর্দ্ধেক কল্পনা আর অর্দ্ধেক মানবী'। দেশের কাব্য-সংসারে প্রেম ও কাম অবিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, কামের বাহুপাশ হইতে কবি প্রেমকে উদ্ধার করিয়া বাঁচাইয়াছেন। এইরূপে রবীন্দ্র-কাব্যে অনাবিল প্রেমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নারী দেবী হইয়াছে—কামের ভোগের উপকরণগুলিও পবিত্র মহিমা লাভ করিয়াছে। কবি বুঝাইয়াছেন—'যারে বলে ভালবাসা, তারে বলে পূজা'। কবি নারীত্বের দেবমন্দির গড়িয়া স্বপ্নময় যৌবনকেও নূতন করিয়া গড়িয়াছেন তাহার পূজারী করিয়া। কবি মিলনকে সংযত রাজশ্রী দান করিয়াছেন, বিরহকে তপস্যায় পরিণত করিয়াছেন।

কবি বিশ্বপ্রকৃতির যে রূপে প্রথমে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, শেষ যৌবনে তিনি আর সেই ঐন্দ্রিয়িক সৌন্দর্যে তৃপ্ত থাকিতে পারেন নাই—বিশ্বপ্রকৃতিকে কবি নব নব রসৈশ্বর্যে মণ্ডিত করিয়া লইয়াছেন। তখন বর্ষা আসিয়াছেন নবযৌবনা শ্যাম-গম্ভীরা সরসার রূপে ঘনগৌরবে, বসন্ত আসিয়াছেন পীতাম্বর পরিয়া পীত উত্তরীয় উড়াইয়া, সন্ধ্যা আসিয়াছেন খোলা-জানালায় শব্দবিহীন চরণপাতে, রাত্রি দেখা দিয়াছেন শ্যামা সুন্দরী সুগম্ভীরা একেশ্বরী রাণীর রূপে, কালবৈশাখী আসিয়া-ছেন তাণ্ডবরত ঈশানের বেশে, বৈশাখ দেখা দিয়াছেন রুদ্র সন্ন্যাসীর রূপে। কবি জড় প্রকৃতিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজের সৃজন প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

দেশমাতার প্রতিমা গড়িয়া কবি তাহাতে প্রাণসঞ্চার করিয়া গিয়াছেন—এ মূর্তি ইতিপূর্বে আর কেহ গড়ে নাই, এ সৃষ্টি একেবারে নূতন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'ও এই বিচিত্র-রূপিণী মাতৃদেবীর প্রতিষ্ঠা হয় নাই। কবি দেশমাতৃকার পূজার মন্দির গড়িয়াছেন প্রাচীন ভারতের মহিমার উপকরণে। তাহার চারিপাশে আধ্যাত্মিক ভারতের তপোবনের পরিবেষ্টনী ঘিরিয়া দিয়াছেন এবং ভবিষ্যতের আশা ও মহত্ত্বের সম্ভাবনীয়তা দিয়া দেবীর বেদী রচনা করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক পৌরাণিক আধ্যাত্মিক আদর্শগুলিকে মহিমাময় রূপ দান করিয়াছেন কবি রবীন্দ্রনাথ। প্রাচীন ভারতের রাজসভা তপোবন কবিকুঞ্জ রাজপথ পুর জনপদ ইত্যাদিকে

শ্রদ্ধার মহিমায় মণ্ডিত করিয়া উপস্থাপিত করিয়াছেন আমাদের এই কবি।

কবি জীবনকে নব নব রূপ ও রূপক দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, মরণকেও তিনি নব রূপ ও মাহাত্ম্য মাধুর্য দান করিয়াছেন। আজ পর্যন্ত কোনো কবি মরণকে এমন বরণীয় মনে করিতে পারেন নাই—

মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান!

মরণকে বরণ করিতে কোনো কবির এমন ভাব হয় নাই—

'তাঁর বাম আঁখি ফুরে থর থর
তাঁর হিয়া দুরুদুরু দুলিছে,
তাঁর পুলকিত তনু জরজর
তাঁর মন আপনারে ভুলিছে!'

কবি মরণকে বামদেব রূপে না দেখিয়া রুদ্রের দক্ষিণ-রূপ তাহার মধ্যে দেখিয়াছেন। ভারতের উপনিষদের মৃত্যুঞ্জয় প্রভাব কবির চিত্তে মরণের রুদ্রতাকে লোপ করিয়াছে।

দেশে দেবতার অভাব ছিল না, কিন্তু কবি পরের সৃষ্টিতে সন্তুষ্ট নহেন—জীবনের গভীরতম প্রদেশের শ্রেষ্ঠ সাধনার অর্ঘ্য প্রয়োগের জন্য কবি কল্পমহিমায় আপন মনের মাধুরী মিশায়ে 'জীবনদেবতা' রচনা করিয়াছেন—জীবনের বৈচিত্র্যের সূত্রটি তাঁহার হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু কবি আপনার মনগড়া দেবতার সেবাতেই তুষ্ট রহেন নাই—আপনার

আরাধ্য অন্তরতমকে সন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছেন; অবশেষে আপনার 'জীবনদেবতা'কে বিশ্বজীবন-স্রষ্টার সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন—জীবনের 'নৈবেদ্য' তাঁহার চরণে 'উৎসর্গ' করিয়াছেন।

ভগবানকে 'রাজা' বা 'প্রভু'র রূপে দেখিয়া কবি তুষ্ট হইতে পারেন নাই। ঐশ্বর্যের মধ্যে কাহাকেও আপনার করা যায় না। তাই মাধুর্যের মধ্যে ভগবানকে পাইয়া কবি তাঁহাকে আত্মার আত্মীয় করিতে চাহিয়াছেন। কবি 'খেয়া'-ঘাটে উপনীত হইয়াও 'জীবন মৃত্যু রৌদ্র ছায়া ঝটিকার বারতা'র মধ্যেও তাঁহার সঙ্গে নব নব সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। খেয়া পার হইয়া কবি মিস্‌টিক সাধকের রূপে ভগবানের সঙ্গে নব নব যোগসূত্র রচনা করিয়াছেন। পরমাত্মা তাঁহার কাছে কখনও অতিথি, কখনো বর, কখনো রাজার দুলাল, কখনো দয়িত, কখনো সখা, কখনো ভিখারী।

বিশ্বের সহিতও কবির সহস্র যোগসূত্র। কবির প্রতিভাধারা মহাসাগরে মিশিয়া শেষ হইয়া যায় নাই, শেষের মধ্যেও যে অশেষ আছে—কবিপ্রতিভা সেই অশেষে মিলিয়া চিরদিনের জন্য অশেষ হইয়া আছে।

কবির কাব্যের উপাদান বদলায় নাই। কিন্তু সে উপাদান আর সঙ্কীর্ণ দেশকালের গণ্ডীর মধ্যে রূপ লাভ করে না। কবির সৃজনীপ্রতিভা এখন বিশ্বের সহিত,—

মহামানবের সহিত—বিশ্বনাথের সহিত—মহাকালের সহিত নব নব সম্বন্ধে সারূপ্য লাভ করিয়াছে। বিশ্বের আধ্যাত্মিক কল্যাণ সৃষ্টিতেই, আর জড়বাদের আক্রমণ হইতে সেই কল্যাণকে রক্ষা করাতেই সত্য শিব সুন্দরের সেবকের সৃষ্টিপ্রতিভার পূর্ণ পরিণতি ঘটিয়াছে।

সৌন্দর্যবোধ

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের পূজারী। তাই তিনি বস্তুনিরপেক্ষ সৌন্দর্যের গুণগান কবিতা-বাহনে জগতে ধ্বনিত করিয়াছেন। যে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর তীব্র অনুভূতি তিনি অন্তরের নিভৃত কোণে পাইয়াছেন, তাহারই বিকাশ জগতে প্রকৃতির মধ্যে অনন্ত বিচিত্র রূপে তিনি দেখিতে পাইয়াছেন। এই অনন্ত সৌন্দর্যই বহির্জগতে বিকীর্ণ এবং অন্তর্জগতে স্থির ধীর এবং স্তব্ধ। তিনি সেই অন্তরবাসিনী সৌন্দর্যদেবীর প্রতিমূর্তি চাঞ্চল্যময় জগতে উপলব্ধি করেন। বহির্জগৎব্যাপী সমগ্র সৌন্দর্যের সমষ্টিকে তিনি উর্ব্বশীরূপে মূর্ত করিয়াছেন। সৌন্দর্য একটি সত্ত্বা মাত্র, তাই বিশ্বমানবের ভিতর একটি সৌন্দর্যতৃষ্ণা লাগিয়া আছে এবং সৌন্দর্যলাভের লোভ তাহার হৃদয়ে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া রাখে। পরিপূর্ণ সৌন্দর্য আমাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত। তাই অস্কার ওয়াইল্ড্ বলিয়াছেন—

"The only beautiful things are things that do not concern us."

চিত্রা, জ্যোৎস্নারাতে, পূর্ণিমা, উর্ব্বশী ও বিজয়িনী প্রভৃতি কবিতার ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যানুভূতি বিশেষ-

ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কবির মানস-প্রতিমা সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর রূপ ভিন্ন ভিন্ন কবিতার ভিতর দিয়া বিভিন্নভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু তাহাদের সকলের অন্তর্নিহিত কথাটি এক, একই অনুভূতি বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

'চিত্রা' কবিতাটিতে কবি সৌন্দর্যকে বহির্জগতের মধ্যে একপ্রকারে দেখিয়াছেন, এবং অন্তরে ভিন্নপ্রকারে তাহাকে দর্শন করিয়াছেন। বাহিরে সৌন্দর্যকে তিনি প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর মধ্য দিয়া নানা ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে বর্ণনা করিয়াছেন। বহির্জগতের সৌন্দর্যদেবীর রূপ বহু বস্তুর মধ্য দিয়া বহু রূপে প্রকাশ পাইয়াছে—ফলে ফুলে গন্ধে বর্ণে নানা সঙ্গীতে নানা রসে নানা ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু বাহিরের সেই বহুবিভক্ত সৌন্দর্যই অন্তরে অভিন্ন একক রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। বাহিরে যে সৌন্দর্য বিচিত্ররূপিণী বহু বিভক্তা চঞ্চলা, অন্তরে সে-ই এক অদ্বিতীয় অখণ্ড স্থির গম্ভীর।

এই যে সৌন্দর্য, যাহার সত্তা কবি বহির্জগতে ও অন্তর্জগতে উভয়ত্রই অনুভব করিয়াছেন, তাহাকেই তিনি 'জ্যোৎস্নারাতে' আহ্বান করিয়াছেন ক্ষুব্ধ হৃদয় শান্ত করিবার জন্য, তাঁহার দেহ-মনের সর্বব্যথা শুভ্র সুকোমল করপদ্ম-দলস্পর্শে দূর করিয়া দিবার জন্য। কবি বলিতেছেন যে আজি এই সুন্দর জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রিতে, এই নীরব নিস্তব্ধ রজনীতে তুমি তোমার অপার রহস্যের আচ্ছাদন উন্মোচন করিয়া, নগ্নসৌন্দর্যের রূপ উদঘাটন করিয়া তরুণী লক্ষ্মীর মতো

আমার হৃদয়ের অতি নিকটে আঁখির সম্মুখে আসিয়া দেখা দাও। সৌন্দর্যপিপাসু কবিহৃদয় কাতর ভাবে বলিতেছে—

আমি একা
আছি জেগে, তুমি একাকিনী দেহ দেখা
এই বিশ্বসুপ্তি মাঝে, অসীম-সুন্দর
ত্রিলোক-নন্দন-মূর্তি! আমি যে কাতর
অনন্ত তৃষায়। ....

অন্যত্র কবি বলিয়াছেন—

খোলো দ্বার খোলো দ্বার,
তোমাদের মাঝে লহ মোরে একবার
সৌন্দর্যসভায়.........
বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী জ্যোতির্ময়ী বালা,
আমি কবি তারি তরে আনিয়াছি মালা!

সৌন্দর্যপিপাসু কবি তাঁহার কল্পলোকবাসিনী সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া সেই বিশ্বসোহাগিনী বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে আরাধনা করিয়া আরও এক জায়গায় বলিয়াছেন—

কোনো মর্ত্য দেখে নাই
যে দিব্য মূরতি, আমারে দেখাও তাই
এ বিশ্রব্ধ রজনীতে নিস্তব্ধ বিরলে।

যে সৌন্দর্যের অপরূপ রূপলাবণ্যসুধা পান করিবার জন্য কবি-হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, পূর্ণিমা রাত্রিতে দেখি সেই সৌন্দর্যদেবীই নিজে কবির কাছে অভিসারিকার বেশে আসিয়া

'মুখানি বাড়ায়ে' দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছেন। কিন্তু কবি তখন শেলী, গেটে, কোল্‌রীজ প্রভৃতির কাব্যতত্ত্বের সমালোচনায় ব্যস্ত, অভিসারিকার সরম-সঙ্কুচিত মুখের দিকে তাকাইবার অবসর তাঁহার নাই। হঠাৎ যখন শ্রান্ত কবি বাতি নিবাইয়া শয়নের উপক্রম করিলেন, অমনি চমকিয়া দেখিলেন সৌন্দর্যের উদার রূপ অনাবিল চন্দ্রকরোজ্জ্বল কান্তিতে তাঁহার গৃহে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। সৌন্দর্যমুগ্ধ কবি তখন বিপুল সৌন্দর্যের উদার প্রকাশের নগ্নমূর্তির নিকটে আনতমস্তক হইয়া আপন হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন,—উচ্ছ্বসিত কবিহৃদয় গাহিয়া উঠিল—

হে সুন্দরী, হে প্রেয়সী, হে পর্ণ পূর্ণিমা,
অনন্তের অন্তরশায়িনী, নাহি সীমা
তব রহস্যের! ......
কি জানি কেমন ক'রে লুকায়ে দাঁড়ালে
একটি ক্ষণিক ক্ষুদ্র দীপের আড়ালে,
হে বিশ্বব্যাপিনী লক্ষ্মী। ......

কিন্তু পরে কবি 'উর্বশী' ও 'বিজয়িনী' কবিতাদ্বয়ের মধ্য দিয়া সেই সৌন্দর্যদেবীকেই সমস্ত মানব-সম্বন্ধের বিকার হইতে, সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্কীর্ণ সীমা হইতে দূরে তাহার বিশুদ্ধিতার মধ্যে, তাহার অখণ্ডতায় উপলব্ধি করিবার তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। সৌন্দর্য সমস্ত প্রয়োজনের বাহিরে, সে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ একটি সত্তা মাত্র। জগতের

কোন্ রহস্য-সমুদ্রের গোপন অতলতার মধ্যে তাহার উদ্ভব। সমস্ত বিশ্বসৌন্দর্যের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে তাহার বিদ্যুৎ-চঞ্চল অঞ্চল-আন্দোলনের আভাস পাওয়া যায়। ইহারই নৃত্যের ছন্দে ছন্দে সিন্ধুর তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত, শস্যশীর্ষে ধরণীর শ্যামল অঞ্চল লুণ্ঠিত, ইহারই স্তনহারচ্যুত মণিভূষণ অনন্ত আকাশে তারায় তারায় বিকীর্ণ, বিশ্ববাসনার বিকসিত হৃদয়-পদ্মের উপর ইহার অতুলনীয় অতিলঘুভার পাদপদ্ম স্থাপিত। উর্বশী সমস্ত রূপের মধ্যে এক অপরূপের আবির্ভাব। সৌন্দর্যের এমন সুতীব্র অথচ নির্মল অনুভূতি আর কোথাও দেখা যায় না। এই উর্বশীর পরিকল্পনার ভিতর দিয়া কবি অবিশেষণযোগ্যা সৌন্দর্যদেবীকে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সৌন্দর্যদেবী নিজেই নিজের জননী। তিনি প্রথম হইতেই পূর্ণপ্রস্ফুটিতা। তাঁহার নিকটে সুধা ও বিষের কোনো পার্থক্য নাই, আছে কেবল তাহাদের সংমিশ্রণ—তাঁহাকে বিশ্বের কামনা-রাজ্যের রাণী সুন্দরী উর্বশী ও কল্যাণী লক্ষ্মীর মিলন বলা যাইতে পারে। কবি উর্বশীর পরিকল্পনার ভিতর দিয়াই তাঁহার স্বপ্নলোকবাসিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মীর রূপটি পূর্ণ ভাবে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

'বিজয়িনী' কবিতাতে কবির এই সৌন্দর্যানুভূতি একটি রমণীমূর্ত্তির ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। এই বিজয়িনীকে তিনি সকল সৌন্দর্যের আধার করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি সকল সৌন্দর্যের আদি সত্তা। সৌন্দর্য দেখিলেই মানবের

মনে ভোগবিলাসের বাসনা উপস্থিত হয়। কিন্তু যিনি সকল সৌন্দর্যের আদি সৌন্দর্য, যিনি ইটার্নাল বিউটী, তাঁহাকে দেখিলে লোভ বাসনা আর থাকিতে পারে না, তাঁহার দর্শনে চিত্ত নিমেষহীন হইয়া যায়, মনে তৃপ্তি ও ভক্তির উদয় হয়। তাই মদনদেব প্রথমে তাঁহার প্রতি পুষ্পশর সন্ধান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে সৌন্দর্যের মহিমান্বিত গম্ভীর মূর্তি যখন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন তিনি সৌন্দর্যের সেই নগ্নমূর্তির মহিমার সম্মুখে অবনত হইয়া আপনার ধনুর্বাণ তাঁহার চরণে সমর্পণ করিলেন—

নতশিরে পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি'। নিরস্ত্র মদন-পানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।

'বিজয়িনী' কবিতায় সম্পূর্ণ সৌন্দর্য মূর্ত ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। এই মহিম-সৌন্দর্যের মহিমা এত তীব্র ও মহান্ যে এমন কি মদন পর্যন্ত তাহার সম্মুখে পরাভব মানিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছে। প্রকৃত এবং পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়লালসার অতি উচ্চস্তরে অবস্থিত, তাই এমন সৌন্দর্যের সম্মুখীন হইলে মানব সমস্ত লালসা বিস্মৃত হইয়া একটি আত্মপ্রসাদ ও পরিতৃপ্তি অনুভব করে।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে 'চিত্রা'র এই কয়েকটি কবিতার ভিতর দিয়া কবির সৌন্দর্যের ধারণা

প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথমে যে সৌন্দর্যকে তিনি বাহিরে ও অন্তরে অনুভব করিতেন, তাহাকেই পাইবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া কাতর ভাবে আহ্বান করিয়াছেন। সৌন্দর্যদেবী তখন সুন্দর জ্যোৎস্না-রজনীতে আসিয়া কবিকে আপনার উদার সৌন্দর্যের নগ্নরূপ দেখাইয়া গেলেন এবং কবি সেই সৌন্দর্যেরই রূপ বর্ণনা করিলেন উর্বশীর ও বিজয়িনীর রূপকে অবলম্বন করিয়া,—যে রূপের কাছে আমাদের ভোগবাসনা-মুগ্ধ প্রাণমন ভাবে ও ভক্তিতে পরাভব স্বীকার করিয়া পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িতে চায়।

মিস্‌টিসিজ্‌ম্‌

বিশ্ব, প্রকৃতি, মহামানব যুগধর্ম ইত্যাদি সৃষ্টির রূপ-বৈচিত্র্যের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যে সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ কবির নয়। কবি তাহাদের সঙ্গে নব নব রস-সম্বন্ধ সৃষ্টি করেন। সাধারণ লোক আপন আপন জীবনে কবির রচিত সম্বন্ধ অনুসরণ করে না। কিন্তু কবি, সাধক, দ্রষ্টাগণ যুগে যুগে স্রষ্টার সঙ্গে যে গভীর রস-সম্বন্ধ সৃষ্টি করেন, লোকে তাহাকেই রসধর্ম বলিয়া মানিয়া লয়। কবিরা যে বলিয়া গিয়াছেন—ভগবান জ্ঞান ধ্যান তপস্যা ত্যাগ বৈরাগ্য ইত্যাদির দ্বারা অধিগম্য ও নৈয়ায়িক যুক্তির দ্বারা তাঁহার অস্তিত্ব প্রতিপাদ্য, সে তত্ত্ব জনসাধারণ অনুসরণ করিতে পারে না। সাধক কবিরা যে ভগবানের সহিত অন্তরঙ্গ রস-সম্বন্ধের কথা বলিয়াছেন তাহাই মহামানবের জীবনধর্ম হইয়া উঠিয়াছে। রসময়ের সহিত এই রস-সম্বন্ধ-বন্ধনের নামই মিস্‌টিসিজ্‌ম্‌।

নদী যেমন দুই কূলে শ্যাম সমারোহ পরিবেশন করিয়া সর্ব কর্ম সমাধা করিয়া তাহার অন্তহীন ধারা সিন্ধুর চরণে জলাঞ্জলি অর্পণ করে, রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের মাধুর্য-

ধারা তেমনি মর্ত্যের সকল আশা মিটাইয়া অনন্তের সহিত মিলিত হইয়াছে।—

মর্ত্যবাসীদের তুমি যা দিয়েছ প্রভু
মর্ত্যের সকল আশা মিটাইয়া তবু
রিক্ত তাহা নাহি হয়। তার সর্বশেষ
আপনি খুঁজিয়া ফিরে তোমারি উদ্দেশ।

নদী ধায় নিত্যকাজে, তার সর্ব কর্ম সারি'
অন্তহীন ধারা তার চরণে তোমারি
নিত্য জলাঞ্জলিরূপে ঝরে অনিবার।
কুসুম আপন গন্ধে সমস্ত সংসার
সম্পূর্ণ করিয়া তবু সম্পূর্ণ না হয়,—
তোমারি পূজায় তার শেষ পরিচয়।
সংসারে বঞ্চিত করি' তব পূজা নহে।

তাই রবীন্দ্র-প্রতিভার উপাস্য সিন্ধুরই মত অনন্ত অরূপ বিরাট। কবি তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দান উৎসর্গ করিবার জন্য যৌবনেই দেবতা খুঁজিয়াছেন—

তবু ওগো দেবী, নিশিদিন করি পরাণপণ
চরণে দিতেছি আনি'
মোর জীবনের সকল শ্রেষ্ঠ সাধনার ধন
ব্যর্থ সাধনখানি।

মানুষকে দেবতা করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। কবি 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' জীবনদেবতা রচনা করিয়াছেন, তাহাতেও তিনি তৃপ্তি লাভ করেন নাই।

তাহার পরে কবি ভগবানকে নানা ভাবে নানা রূপে আহ্বান করিয়া মনের বেদীতে বসাইয়াছেন—অপরূপকে রূপ না দিলে, নির্গুণকে গুণময় করিয়া না তুলিলে, অব্যক্তে ব্যক্তিত্ব আরোপ না করিলে যে সকল মাধুর্যই নিষ্ফল হইবে তাহা 'নৈবেদ্য' রচনার সময়ে তিনি বুঝিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি ঐশ্বর্যমণ্ডিত ভগবানের সম্মুখে জোড়করে দাঁড়াইলেন—

করি জোড়কর হে ভুবনেশ্বর,
দাঁড়াবো তোমারি সম্মুখে।

এবং

মহারাজ ক্ষণেক দর্শন দিতে হবে।

কবি ভগবানকে রাজা, রাজার দুলাল, প্রভু ইত্যাদি রূপে কল্পনা করিয়াছেন 'খেয়া'য়। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। ঐশ্বর্যের সঙ্গে মাধুর্যের যে দ্বন্দ্ব তাহা তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। তাহার পরে কবি ভগবানকে অন্তরতর করিয়া তুলিবার জন্য সাহসী হইলেন,—তখন তাহাকে তিনি অতিথি, সখা, বর, দয়িত ইত্যাদি মাধুর্যময় রূপে কল্পনা করিয়া ক্রমে অন্তরের আত্মীয় করিয়া লইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে—এ বিশ্বে যাহা কিছু মোহন, যাহা কিছু মধুর, যাহা কিছু প্রিয় সমস্তের মধ্যেই তাঁহাকে দেখিয়াছেন নৈবেদ্য, খেয়ায়, গীতাঞ্জলিতে ও গীতিমাল্যে। মানবকে দেবতার পদে বসাইয়া একদিন কবির তৃপ্তি হয় নাই, পরে

মহামানবকে ভালবাসিতে পারিয়া তাহার মধ্যেই তিনি মহাদেবকে দেখিয়াছেন। কিন্তু তবু তাঁহার আকুল অতৃপ্তির অন্ত হয় নাই।

এই অতৃপ্তির দ্বারাই পরিমিত হয় রবীন্দ্র-প্রেমের আকৃতি ও গভীরতা। কবির চিত্তে রসময়ের সহিত মিলনাগ্রহের অন্ত নাই। তাহা ছাড়া, যে কবির চিত্তে শত সহস্র ইন্দ্রিয় উন্মুক্ত সেই কবিচিত্তের বিপুলতারও সীমা নাই। মাধুর্যের যে অনুভূতি কবির অন্যান্য রচনায় গভীর ভাবেই ব্যঞ্জিত হইয়াছে, তাহার পরিপূর্ণ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি যে গভীরতম ও নিবিড়তম হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

তবু ভারতবর্ষের পক্ষে এটুকু যথেষ্ট নহে। এ দেশ মিষ্টিক দরদী ও সাধক কবির দেশ—ভগবৎ প্রেমের চূড়ান্ত নিদর্শন এদেশে যথেষ্ট। তাই দেখি কয়েকটি কারণে রবীন্দ্রের রসধর্ম চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছাতে পারে নাই, জাতিরও জীবনধর্ম হইয়া উঠে নাই। যে কয়েকটী কারণে রবীন্দ্রনাথের রসধর্ম চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছিতে পারে নাই এখানে তাহার উল্লেখ করা হইল:—

১। ভক্ত প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ যখনই প্রেমে আত্মহারা হইতে চাহিয়াছেন, শিল্পী রবীন্দ্রনাথ তখনই ছন্দের সুসঙ্গতির বল্গার দ্বারা তাঁহাকে শাসন করিয়াছেন।

২। রবীন্দ্রনাথ অন্য কারো আরাধ্য ব্যক্তিত্ব গ্রহণ না করিয়া ভাগবতী শক্তিতে আপনার রচিত ব্যক্তিত্ব

আরোপ করিয়াছেন। সে ব্যক্তিত্ব কোনো বিশিষ্ট অবিচল বিগ্রহ-স্তুপ ধারণ করে নাই—জীবন্ত হইয়াও উঠে নাই—মুহূর্মুহূ সে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনও ঘটিয়াছে অতৃপ্তির ফলে। ভাগবত ব্যক্তিত্ব মূর্ত জীবন্ত ও অচঞ্চল হইয়া না উঠিলে মর্মাত্মকতা ক্ষুণ্ণ না হইলেও রসাত্মকতা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে—তাহাতে প্রেমের নিবিড়তা ও আকুলতাও কমিয়া যাইতে পারে।

৩। ভারতবর্ষের সাধক কবিরা কেবল রচনায় নয়, জীবনের সর্ববিভাগেই সাধক—তাঁহাদের 'সকল বাক্য সকল কর্ম প্রকাশে তাঁর আরাধনা'। ভাবমগ্ন অবস্থার সঙ্গে তাঁহাদের জীবনের সর্বাবস্থারই সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে তাহা নাই। এইজন্যই তাঁহাদের রচনার গভীর আন্তরিকতা রবীন্দ্র-রচনায় পাওয়া যায় না।

৪। যুগে যুগে ভগবানের যে মানস প্রতীকগুলি রস-মূর্তি হইয়া দেশবাসীর প্রেম আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে, সেগুলি কোটি কোটী হৃদয়ের প্রেমডুরির বন্ধনে আমাদের প্রাণের পরম গোষ্ঠী হইয়া পড়িতেছে। তাঁহাদের পূজা-দেউলের আবেষ্টনেই আমাদের রসজীবন গঠিত। রবীন্দ্রনাথ সে সকল প্রতীক গ্রহণ না করিয়া স্বরচিত প্রতীকের সহিত প্রেমসম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। সেইজন্যই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের প্রেম মধুর রসের সাধক চণ্ডীদাসাদি কবির, অথবা বাৎসল্য রসের সাধক রামপ্রসাদাদির প্রেমের আকূতি ও আকুলতা লাভ করে নাই।

যাঁহারা ভারতবর্ষীয় রসশাস্ত্রের তেমন সন্ধান রাখেন না, তাঁহারা অনেকে মনে করেন রবীন্দ্রনাথের রসধর্মে ইউরোপীয় Scholastic Philosophers, Christian Saints (যথা—St. Augustine, St. Francis of Assissi) ও Psalmists ইত্যাদির প্রভাব আছে। ভগবান রসধর্ম প্রভুধর্ম আরোপ করিয়া দাস্যভাবের সাধনার সূত্রানুসন্ধানে ইউরোপে যাইবার প্রয়োজন নাই,—কবি শান্তরসের দাস্যসাধনার বাণী এ দেশের রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ হইতেই পাইয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজে বেদান্তের আবহাওয়ায় প্রতিপালিত হওয়ার জন্য কবির রসধর্মের পরিপুষ্টিতে বিলম্ব হইয়াছে। কিন্তু বেদান্তের সহিত উপনিষদ ও গীতা ছিল, সেজন্য তিনি যে রসময়—রসো বৈ সঃ—তাহা কবি যৌবনেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। কবির 'নৈবেদ্যে'র বাণী শান্তরসের সাধক সনক সনাতনের এবং দাস্য রসের সাধক অক্রূর উদ্ধব বিদুরের জীবন হইতে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে। শাক্ত ও বৈষ্ণব মিষ্টিকদের প্রভাব কবির কাব্যে খুব সুস্পষ্ট নহে,—সহজিয়া তন্ত্র, পরকীয়া বাদ, অথবা শক্তিসাধনার দ্বারা রবীন্দ্রনাথের রসধর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' বহিরঙ্গসর্বস্ব অনুকৃতি মাত্র।

রবীন্দ্রের রসধর্মে বাউল সাধকদের প্রভাব যথেষ্ট আছে। ভাব-তন্ময় কবি অনেক সময়ে তুড়ি দিয়া বিশ্বসংসারকে

উড়াইয়া দিয়াছেন। সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর পড়িয়াছে দরদিয়া ও মরমিয়া দলের। বাংলার শ্রীগৌরাঙ্গ কবির জীবনে যাহা করিতে পারেন নাই, উত্তর ভারতের নানক কবীর দাদু সুরদাস তাহা করিয়াছেন। কবি যে শ্রীভগবান আর ভক্তের মধ্যে আর কোনো প্রতীক স্বীকার করেন নাই,—প্রত্যক্ষ ও অপরতন্ত্র ভাবে ভগবানের সঙ্গে ভক্তির মিলন-মাধুর্য উপভোগ করিতে পারিয়াছেন,—তাহা কেবল ঐ সকল মহাপুরুষদের বাণীর প্রভাবে। চিরপ্রচলিত যুগযুগারাধিত রসমূর্তিগুলিকে পরিহার করিয়া বৈদিক ও পৌরাণিক প্রভাব এড়াইয়া—রসময়ের সহিত মিলন-লীলার অভিনয় নানক কবীর প্রভৃতি সাধক কবিদের বাণীতে এদেশে প্রথম পরিস্ফুট। হয়তো সদ্য মুসলমানাক্রান্ত ভারতবর্ষে এই রস-ধর্মের প্রয়োজন হইয়াছিল, হয়তো সূফিরসধর্ম তাঁহাদের বাণীতে ওতঃপ্রোত। যেজন্যই হোক, ভারতে নূতন রসধর্মের উদয় হইয়াছিল। সেই রসধর্ম রবীন্দ্র-কাব্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মিস্‌টিসিজ্‌মের সূত্র অনুসন্ধান করিতে হইলে পাঠান যুগের উত্তর ভারতেই করিতে হইবে।

জীবনদেবতা

জীবনদেবতা কবিজীবনের দ্বৈত সত্তা। সমগ্র জীবনের মধ্যে আত্মপ্রকাশের যে প্রেরণা, কবি রবীন্দ্রনাথ তাহাকেই জীবনদেবতা বলিয়াছেন। এই জীবনদেবতা অহরহ কবির অন্তরের অন্তরালে বসিয়া কবিকে তাঁহার কাব্যরচনার প্রেরণা দিতেছেন। কবি ইহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং সেই অন্তর্যামী শক্তিকে তিনি তাঁহার অনেক কবিতারই ভিতর দিয়া বারংবার তাঁহার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছেন। জীবনদেবতা—কবির অন্তর্যামী শক্তি, কবিকে দিয়া নব নব সৃষ্টি করাইয়া লন। তিনি কবিকে নানা অবস্থায় ফুল বা সঙ্গীতের মত সুন্দর ভঙ্গীতে ফুটাইয়া তুলিতেছেন। কবি যেন জীবনদেবতার হাতের বীণা। জীবনদেবতার নিপুণ অঙ্গুলি-স্পর্শে কবির কবিবীণায় যেন বিচিত্র সুরলহরী ধ্বনিত হইয়া উঠে।

আমি কি গো বীণা যন্ত্র তোমার ?
ব্যথায় পীড়িয়া হৃদয়ের তার
মূর্চ্ছনাভরে গীত-ঝঙ্কার
    ধ্বনিছ মর্ম মাঝে !
আমার মাঝারে করিছ রচনা
অসীম বিরহ, অপার বাসনা,

কিসের লাগিয়া বিশ্ববেদনা
মোর বেদনায় বাজে ?
মোর প্রেমে দিয়ে তোমার রাগিণী
কহিতেছ কোন্ অনাদি কাহিনী,
কঠিন আঘাতে ওগো মায়াবিনী
জাগাও গভীর স্বর।

এই জীবনদেবতাই কবিকে অতীতের ভিতর দিয়া অনাগতের মধ্যে প্রাণের পালে প্রেমের হাওয়া লাগাইয়া কবির সোনার তরীকে কাল্‌মহানদীর তীরে তীরে নূতন নূতন হাটে বহন করিয়া লইয়া চলেন। তাই কবি বলিয়াছেন—

ভেঙ্গে দাও তবে আজিকার সভা,
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা,
নূতন করিয়া লহ আরবার
চির পুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবনডোরে।

জীবনদেবতা যে কি সে সম্বন্ধে কবি নিজেও 'বঙ্গভাষার লেখক' নামক গ্রন্থে তাঁহার আত্মজীবনী রচনা-প্রসঙ্গে ইঙ্গিত দিয়াছেন। কবি বলেন—

"জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত সুখদুঃখ,—তাহার সমস্ত যোগ-বিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন। সকল সময়ে আমি তাঁহার আনুকূল্য করিতেছি কি না জানি না, কিন্তু আমার সমস্ত বাধা-বিপত্তিকেও, আমার

সমস্ত ভাঙাচোরাকেও তিনি নিয়তই গাঁথিয়া জুড়িয়া দাঁড় করাইতেছেন। কেবল তাই নয়, আমার স্বার্থ, আমার প্রবৃত্তি, আমার জীবনকে যে অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেছে, তিনি বারেবারে সে সীমা ছিন্ন করিয়া দিতেছেন—তিনি সুগভীর বেদনার দ্বারা, বিচ্ছেদের দ্বারা বিপুলের সহিত বিরাটের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া দিতেছেন। সে যখন একদিন হাট করিতে বাহির হইয়াছিল, তখন বিশ্বমানবের মধ্যে সে আপনার সফলতা চায় নাই—সে আপনার ঘরের সুখ, ঘরের সম্পদের জন্যই কড়ি সংগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু সেই মেঠো পথ, সেই ঘোরো সুখদুঃখের দিক হইতে কে তাহাকে জোর করিয়া পাহাড় পর্বতের অধিত্যকা উপত্যকার দুর্গমতার মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে—

এ কি কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ি!
যেদিকে পান্থ চাহে চলিবারে
চলিতে দিতেছ কই?
গ্রামের যে পথ ধায় গৃহপানে,
চাষিগণ ফিরে দিবা অবসানে,
গোঠে ধায় গরু, বধূ জল আনে
শতবার যাতায়াতে,
একদা প্রথম প্রভাতবেলায়,
সে পথে বাহির হইনু হেলায়,
মনে ছিল, দিন কাজে ও খেলায়
কাটায়ে ফিরিব রাতে,—
পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক,
কোথা যাব আজ নাহি পাই ঠিক,

ক্লান্ত হৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে,
কখনো উদার গিরির শিখরে
কভু বেদনার তমোগহ্বরে
চিনি না যে পথ সে পথের 'পরে
চলেছি পাগলবেশে।

"এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া, বিশ্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্য দান করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না—আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন,—সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎস্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে। সেইজন্য এই জগতের তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে এমন একটা পুরাতন ঐক্য অনুভব করিতে পারি—সেইজন্য এত বড় রহস্যময় প্রকাণ্ড জগৎকে অনাত্মীয় ও ভীষণ বলিয়া মনে হয় না।

আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে
তোমারেই ভালবেসেছি,
জনতা বাহিয়া চিরদিন ধ'রে,
শুধু তুমি আমি এসেছি।
চেয়ে চারিদিকপানে
কি যে জেগে ওঠে প্রাণে!

তোমার আমার অসীম মিলন
যেন গো সকল খানে !

কতদিন এই আকাশে যাপিনু
সে কথা অনেক ভুলেছি,
তারায় তারায় যে আলো কাঁপিছে
সে আলোকে দোঁহে দুলেছি।

তৃণ-রোমাঞ্চ ধরণীর পানে
আশ্বিনে নব-আলোকে
চেয়ে দেখি যবে আপনার মনে
প্রাণ ভরি' উঠে পুলকে !

মনে হয় যেন জানি
এই অকথিত বাণী,—
মূক মেদিনীর মর্ম্মের মাঝে
জাগিছে যে ভাবখানি।

এই প্রাণে ভরা মাটির ভিতরে
কত যুগ মোরা যেপেছি,
কত শরতের সোনার আলোকে
কত তৃণে দোঁহে কেঁপেছি !

* * * * *

লক্ষবরষ আগে যে প্রভাত
উঠেছিল এই ভুবনে,
তাহার অরুণ কিরণ-কণিকা
গাঁথনি কি মোর জীবনে ?

সে প্রভাতে কোন্‌খানে
জেগেছিনু কেবা জানে?
কি মূরতি মাঝে ফুটালে আমারে
সেদিন লুকায়ে প্রাণে।
হে চির পুরাণো, চিরকাল মোরে
গড়িছ নূতন করিয়া!
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর,
রবে চিরদিন ধরিয়া!

"কেবল অনুভবের দিক দিয়া বলিতেছি, আমার মধ্যে আমার অন্তর্দেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে—সেই আনন্দ, সেই প্রেম আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আমার বুদ্ধি মন, আমার নিকট প্রত্যক্ষ এই বিশ্বজগৎ, আমার অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ পরিপ্লুত করিয়া আছে। এ লীলা ত আমি কিছুই বুঝি না, কিন্তু আমার মধ্যেই নিয়ত এই এক প্রেমের লীলা। আমার চোখে যে আলো ভালো লাগিতেছে, প্রভাত-সন্ধ্যার যে মেঘের ছটা ভালো লাগিতেছে, তৃণতরুলতার যে শ্যামলতা ভালো লাগিতেছে, প্রিয়জনের যে মুখচ্ছবি ভালো লাগিতেছে—সমস্তই সেই প্রেমলীলার উদ্বেল তরঙ্গলীলা। তাহাতেই জীবনের সমস্ত সুখদুঃখের, সমস্ত আলো-অন্ধকারের ছায়া খেলিতেছে।

"আমার মধ্যে এই যাহা গড়িয়া উঠিতেছে এবং যিনি গড়িতেছেন, এই উভয়ের মধ্যে যে একটি আনন্দের সম্বন্ধ, যে একটি নিত্য প্রেমের বন্ধন আছে, তাহা জীবনের সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিলে সুখ দুঃখের মধ্যে একটি শান্তি আসে। যখন বুঝিতে পারি আমার প্রত্যেক আনন্দের উচ্ছ্বাস তিনি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন,—আমার প্রত্যেক দুঃখবেদনা তিনি নিজে গ্রহণ করিয়াছেন, তখন জানি যে,

কিছুই ব্যর্থ হয় নাই,—সমস্তই একটা জগদ্ব্যাপী সম্পূর্ণতার দিকে ধন্য হইয়া উঠিতেছে।

*　　　*　　　*　　　*

"আমার অন্তর্নিহিত যে সৃজনশক্তির কথা লিখিয়াছি—যে শক্তি আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে, সমস্ত ঘটনাকে ঐক্যদান, তাৎপর্যদান করিতেছে, আমার রূপান্তর—জন্মজন্মান্তরকে একসূত্রে গাঁথিতেছে, যাহার মধ্য দিয়া বিশ্বচরাচরের মধ্যে ঐক্য অনুভব করিতেছি তাহাকেই 'জীবনদেবতা' নাম দিয়া লিখিয়াছিলাম—

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব　　সকল তিয়াষ
আসি' অন্তরে মম।
দুঃখসুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষাসম।
কত যে বরণ, কত যে গন্ধ,
কত যে রাগিণী কত যে ছন্দ,
গাঁথিয়া গাঁথিয়া করেছি বয়ন
বাসর শয়ন তব,
গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া
মূরতি নিত্য নব।

রবীন্দ্রকাব্যে যে অন্তর্যামী শক্তিকে 'জীবনদেবতা' বলা হইয়াছে, সকল যুগের ও সকল কালের কবি ও স্রষ্টা তাঁহাদের অন্তরের অন্তরালে এমনই এক শক্তির অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন—যে শক্তি তাঁহাদিগের কবিতায় বা সৃষ্টিতে অতুলনীয় মধুরতা ও সৌন্দর্যের সঞ্চার করেন। ইহাকে কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ 'The Serene and the Blessed Mood' বলিয়াছেন। ইহা সক্রেটিসের Dæmon, প্লেটোর Idea,—
......the authors of those great poems which we admire, do not attain to excellence through the rules of any art, but they utter their beautiful melodies of verse in a spirit of inspiration and, as it were, possessed by a spirit not their own."—Plato, Ion.

ইহা Quakers-দের Inner Light বা অন্তরের আলোক, গীতার বিশ্বরূপ, উপনিষদের সর্বভূতান্তরাত্মা, Fechner-এর চৈতন্যময় বিশ্বপুরুষ, এইচ্‌ জি ওয়েল্‌সের The living reality in our lives (God The Invisible King), অথবা The Driver of the Machine Man. আমাদের দেশের বাউলদের কাছে যিনি 'মনের মানুষ', প্রাচীন কবিদের কাছে যিনি সরস্বতী—কল্পনা ও কবিত্বশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী,—রবীন্দ্রনাথের কাছে 'জীবনদেবতা' তিনিই। এই সরস্বতীর প্রসাদে আদি কবি বাল্মীকির কবিত্বস্ফূর্তি হইয়াছিল। ইহাঁরই প্রসাদে কবি কৃত্তিবাসের কবিত্ব রসধারা উৎসারিত হইত।

কবি কৃত্তিবাস তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলে এই অশরীরী শক্তির অনুপ্রেরণা উপলব্ধি করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—

সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে
নানা ছন্দ নানা ভাষা আপনা হইতে স্ফুরে।

কৃত্তিবাসের এইরূপ অনুভূতির সহিত রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত অনুভূতি তুলনীয়—

এ যে সঙ্গীত কোথা হ'তে উঠে,
এ যে লাবণ্য কোথা হ'তে ফুটে,
এ যে ক্রন্দন কোথা হ'তে টুটে
অন্তর বিদারণ।

নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়,
নূতন বেদনা বেজে উঠে তায়
নূতন রাগিণীভরে।—চিত্রা, অন্তর্যামী

রবীন্দ্রনাথ এখানে বলিয়াছেন যে তাঁহার অন্তর্যামী কবি-শক্তির অনুপ্রেরণাবশতই তাঁহার কবিবীণায় নব নব রাগিণী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে।

পূরবীর 'আহ্বান' নামক কবিতাতেও দেখি যে কবির অন্তর্দেবতার অনুপ্রেরণায় তাঁহার কবিত্বরসধারা প্রবাহিত হইয়াছে—

তাই তো কবির চিত্তে কল্পলোকে টুটিল অর্গল
বেদনার বেগে,
মানস-তরঙ্গ তলে বাণীর সঙ্গীত-শতদল
নেচে ওঠে জেগে।

অন্তর্যামী কবি-শক্তির আহ্বানে ও অনুগ্রহে কবির কল্পনা অবাধে উৎসারিত হইয়া গলিয়া বহিয়া ছুটিয়া চলে, বাণীর সঙ্গীত শতদল তখন ফুটিয়া উঠে এবং তখন কবির কবিবীণায় এক অনির্বচনীয় সুরের ঝঙ্কার উঠে।

জীবনদেবতার অনুভূতিকে জীবনে বারংবার ফিরিয়া পাইবার কথা রবীন্দ্রকাব্যে বহুবার ধ্বনিত হইয়াছে। কবি ইহাকে কখনও 'অন্তর্যামী' বলিয়াছেন, কখনও 'জীবনদেবতা' বলিয়াছেন, কখনও ইনি 'লীলাসঙ্গিনী', কখনও 'দোসর', কখনও 'খেলার সাথী'। এই জীবনদেবতাকে কবি বিভিন্ন নামে সম্বোধন করিয়াছেন এবং বিভিন্নরূপে উপলব্ধিও করিয়াছেন। কবির জীবনদেবতা কখনও কবির কাছে 'দেবী', কখনও 'প্রেয়সী'। 'চিত্রা' কাব্যে জীবনদেবতার অনুভূতি বেশ দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তৎপূর্বেই—'সোনার তরীর' যুগে কবির অন্তরে এই জীবনদেবতার অনুভূতি জাগিয়াছে। এই জীবন-দেবতার আহ্বানে কবি 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' করিয়া চলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

> আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরি।
> বলো কোন্ পাড় ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।
> যখনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী,
> তুমি হাসো শুধু মধুর হাসিনী,
> বুঝিতে না পারি, কী জানি কী আছে তোমার মনে।

ইহা দিগন্তবিস্তৃত অসীম সৌন্দর্যসাগরের বুকে কবির নিরুদ্দেশ যাত্রা। 'জীবনদেবতা' কবিকে জানা হইতে অজানায়

লইয়া যাইতেছেন। তিনি নব নব অভিব্যক্তি ও প্রকাশের সামর্থ্য লাভ করিতে করিতে যাত্রা সুরু করিয়াছেন। কিন্তু কবি জানিতে চাহেন যে তাঁহার এই যাত্রার শেষ কোথায়।

নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি'
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি,'
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন গগন-কোণে।
কী আছে হোথায়, চলেছি কিসের অন্বেষণে।

কিন্তু এ যাত্রার শেষ নাই। কবি নিজেই বলিয়াছেন—

শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বল্‌বে!

জীবনদেবতার প্রথম আহ্বানেই কবি এই নিরুদ্দেশ যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন। কারণ অসীমের বুকে যাত্রা করার বারতা তাঁহার অন্তরে অনন্ত আশা আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার করিয়াছিল।

যখন প্রথম ডেকেছিলে তুমি 'কে যাবে সাথে',
চাহিনু বারেক তোমার নয়নে নবীন প্রাতে।
দেখালে সমুখে প্রসারিয়া কর
পশ্চিমপানে অসীম সাগর,
চঞ্চল আলো আশার মতন কাঁপিছে জলে।
তরীতে উঠিয়া শুধানু তখন
আছে কি হোথায় নবীন জীবন,
আশার স্বপন ফলে কি হোথায় সোনার ফলে।
মুখপানে চেয়ে হাসিলে কেবল কথা না বলে॥

তারপরে 'চিত্রা'র যুগে এই জীবনদেবতা প্রথমে অন্তর্যামী, পরে জীবনদেবতা। এই অন্তরবাসিনী কবিশক্তির প্রেরণা-রূপিণীকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিয়াছেন—

এ কি কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী,
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই ?

অন্তরমাঝে বসি' অহরহ
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।

কবির অন্তর্যামী নিয়ন্তা কবিকে লইয়া কৌতুক করেন। কবির কাব্যে তাঁহার সৃজনলীলার আশ্চর্য রহস্য অভিব্যক্ত হয়। এই অন্তর্যামী জীবনদেবতা যখন কবির একান্ত আপন নিতান্ত সাধারণ সাদা সোজা কথার মধ্যে নিত্য-বাণীর সুর মিশাইয়া দিয়া উহাকে অসাধারণ ও অনির্বচনীয় করিয়া তুলেন, তখন কবির আর বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। কবির কথায় বা কবির বর্ণনায় এমন একটা নবীনতা,—এমন একটা অনির্বচনীয় সুর আসিয়া পড়ে যে কবির রচনা তখন আর ব্যক্তিগত থাকে না, উহা বিশ্বের হইয়া উঠে। একান্ত আপন কথায় বিশ্বজনীন সুর ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া কবি বিস্মিত হইয়া যান।

কি বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সঙ্গীতস্রোতে কূল নাহি পাই,
কোথা ভেসে যাই দূরে।
বলিতেছিলাম বসি' একধারে
আপনার কথা আপন জনারে,
শুনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত,
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে,
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে,
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মত।

এই অন্তরতম জীবনদেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া কবি বলিয়াছেন—

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি' অন্তরে মম।

যদিও জীবনদেবতাই মানুষের সুখদুঃখ তুচ্ছতা মহত্ত্ব সব মিলাইয়া মানুষকে গঠন করেন, তবু মানুষ যাহা হইয়া উঠে, তাহা জীবনদেবতার আদর্শ ও ইচ্ছা অনুযায়ী হয় না। আপনার আদি-অন্ত দান করিয়াও মনে হয় জীবনদেবতার প্রেমের বুঝি যথার্থ প্রতিদান দেওয়া হইল না। তাই কবির মনে এই প্রশ্ন জাগিয়াছে।

জীবনদেবতার পূজায় কবি তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ উৎসর্গ করিয়াছেন। কিন্তু 'যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না', তাই পূজা করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। তাই তিনি জীবনদেবতাকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে আমার সমস্ত ব্যর্থতাও কি তোমার মধ্যে সার্থকতা লাভ করিয়াছে?

কি দেখিছ বঁধু মরম-মাঝারে
রাখিয়া নয়ন দুটি,
করেছো কি ক্ষমা যতেক আমার
স্খলন পতন ত্রুটি?
পূজাহীন দিন, সেবাহীন রাত
কত বার বার ফিরে গেছে নাথ
অর্ঘ্যকুসুম ঝ'রে প'ড়ে গেছে
বিজন বিপিনে ফুটি'॥

যে সুরে বাঁধিলে এ বীণার তার
নামিয়া নামিয়া গেছে বার বার,
হে কবি তোমার রচিত রাগিণী
আমি কি গাহিতে পারি?
তোমার কাননে সেচিবারে গিয়া
ঘুমায়ে পড়েছি ছায়ায় পড়িয়া,
সন্ধ্যাবেলায় নয়ন ভরিয়া
এনেছি অশ্রুবারি॥

চিত্রার 'সাধনা' কবিতাতেও কবি তাঁহার জীবনদেবতাকে সম্বোধন করিয়াছেন দেবীরূপে। কবি মনে করেন যে জীবন-

দেবতার এতটুকু স্নেহ-সুকোমল করুণা-কটাক্ষ লাভ করিলে তাঁহার সকল সৃষ্টি সুন্দর ও সার্থক হইয়া উঠিবে—তাঁহার সৃষ্টিতে অনির্বচনীয়তা ফুটিয়া উঠিবে,—কবির ব্যর্থতা সার্থকতায় পরিণত হইবে।

দেবি, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে
অনেক অর্ঘ্য আনি',
আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া অশ্রুজলে
ব্যর্থ সাধনখানি।
তুমি জান মোর মনের বাসনা,
যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না,
তবু বহিয়াছি কঠিন কামনা
দিবস নিশি।

মনে যাহা ছিল হ'য়ে গেল আর,
গড়িতে ভাঙিয়া গেল বারবার,
ভালোয় মন্দ, আলোয় আঁধার
গিয়েছে মিশি।

তবু ওগো দেবী, নিশিদিন করি' পরাণপণ,
চরণে দিতেছি আনি'
মোর জীবনের সকল শ্রেষ্ঠ সাধের ধন
ব্যর্থ সাধনখানি।
ওগো ব্যর্থ সাধন খানি
দেখিয়া হাসিছে সার্থকফল
সকল ভক্তপ্রাণী।

তুমি যদি দেবী, পলকে কেবল
করো কটাক্ষ স্নেহ সুকোমল,
একটি বিন্দু ফেল আঁখিজল
করুণা মানি'
সব হ'তে তবে সার্থক হবে
ব্যর্থ সাধনখানি ॥

কবি বলেন যে তাঁহার অন্তরে সৃষ্টির যে উচ্চতম আদর্শ বর্তমান ছিল তাহা চরিতার্থ করিতে তিনি পারেন নাই—সাধ অনুযায়ী গান শুনাইবার সাধ্য তাঁহার হয় নাই।

মনে যে গানের আছিল আভাস,
যে তান সাধিতে করেছিনু আশ,
সহিল না সেই কঠিন প্রয়াস,
ছিঁড়িল তার।
স্তবহীন তাই রয়েছি দাঁড়ায়ে সারাটি ক্ষণ
আনিয়াছি গীতহীনা
আমার প্রাণের একটি যন্ত্র বুকের ধন
ছিন্নতন্ত্রী বীণা।
ওগো ছিন্নতন্ত্রী বীণা
দেখিয়া তোমার গুণীজন সবে
হাসিছে করিয়া ঘৃণা ॥

কিন্তু—

তুমি যদি এরে লহ কোলে তুলি',
তোমার শ্রবণে উঠিবে আকুলি
সকল অগীত সঙ্গীতগুলি,
হৃদয়াসীনা।

ছিল যা আশায় ফুটাবে ভাষায়
ছিন্নতন্ত্রী বীণা ॥

কবি বলিতে চাহেন যে জীবনদেবতাই তাঁহার সকল সৃষ্টিকে ব্যর্থতার মধ্য হইতে সার্থকতার দিকে লইয়া যাইতেছেন। জীবনদেবতার নিকটে কবি তাঁহার সকল বিফলতা ও সফলতা উৎসর্গ করিয়া দিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন।

'চিত্রা'য় জীবনদেবতা সম্বন্ধীয় শেষ কবিতা 'সিন্ধুপারে'। কবি বলেন যে জীবনদেবতার সঙ্গে কবির যে সম্বন্ধ তাহা কেবল ইহজগতেই পর্যবসিত হইবে না। পরলোকেও কবির সহিত তাঁহার জীবনদেবতা-রূপিণী প্রাণসঙ্গিনীর মিলন হইবে। সেই প্রাণলক্ষ্মী মৃত্যুর ছদ্মবেশে কবিকে জীবন-সিন্ধুর পরপারে লইয়া যাইবে। তারপর পরজীবনের কূলে উপস্থিত হইয়া সে যখন তাহার কালো ঘোমটা খুলিবে, তখন জীবনদেবতার সেই পরিচিত মুখশ্রী দেখিয়া কবির আর বিস্ময়ের অন্ত থাকিবে না।

'এখানেও তুমি জীবনদেবতা!' কহিনু নয়নজলে।
সেই মধুমুখ, সেই মৃদুহাসি সেই সুধাভরা আঁখি,—
চিরদিন মোরে হাসাল কাঁদাল, চিরদিন দিল ফাঁকি!
খেলা করিয়াছে নিশিদিন মোর সব সুখে সব দুখে,
এ অজানাপুরে দেখা দিল পুন সেই পরিচিত মুখে!

তারপর 'কল্পনা'র যুগে ক্লান্ত কবি যখন বিশ্রামের আয়োজন করিতেছিলেন—যখন 'ক্লান্তি টানে অঙ্গ মম প্রিয়ার মিনতি সম',

তখন কবির জীবনদেবতা কবিকে তাঁহার কবিবীণায় নব নব সুর ধ্বনিত করিয়া তুলিবার জন্য 'আবার আহ্বান' করিয়াছেন। কবিকে তাঁহার জীবনদেবতা কোনোদিনও বৈরাগ্যের বাণী শোনান নাই—কারণ কবির জীবনদেবতা চিরজাগ্রত। তিনি যে রাজ্যের রাণী সেখানে 'শান্ত সুরে ক্লান্ত তালে বৈরাগ্যের বাণী' কখনও বাজে না। কবিও তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীর এই আহ্বানে সাড়া দিলেন,—পরম-উৎসাহভরেই বলিলেন—

বল তবে কী বাজাবো, ফুল দিয়ে কী সাজাবো
তব দ্বারে আজ,
রক্ত দিয়ে কী লিখিব, প্রাণ দিয়ে কী শিখিব,
কী করিব কাজ?
যদি আঁখি পড়ে ঢুলে, শ্লথ হস্ত যদি ভুলে
পূর্ব নিপুণতা,
বক্ষে নাহি পাই বল, চক্ষে যদি আসে জল,
বেধে যায় কথা,
চেয়োনাকো ঘৃণাভরে, কোরোনাকো অনাদরে
মোরে অপমান,
মনে রেখো, হে নিদয়ে, মেনেছিনু অসময়ে
তোমার আহ্বান॥

জীবনদেবতা কবির কর্মশক্তিকে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে ডাকিয়াছেন। কবির আত্মশক্তির উপর আস্থা আছে। তাই কবি জীবনদেবতার আহ্বানের উত্তর নির্ভীকভাবেই দিয়াছেন—

হবে, হবে, হবে জয়, হে দেবী, করিনে ভয়,
হবো আমি জয়ী।
তোমার আহ্বানবাণী সফল করিব রাণী,
হে মহিমময়ী।
কাঁপিবে না ক্লান্তকর ভাঙিবে না কণ্ঠস্বর
টুটিবে না বীণা,
নবীন প্রভাত লাগি' দীর্ঘরাত্রি রবো জাগি,'
দীপ নিবিবে না।

অতঃপর 'পূরবী'র যুগে—যখন কবির কথায়ই—

বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিণীর বীণ—

তখনও তাঁহার কবিতায় আমরা দেখি যে তারুণ্যের রং ফুটিয়া উঠিয়াছে। বার্ধক্যের কবিতা হইলেও 'পূরবী'র কবিতাসমূহ যৌবনের আনন্দরসে উচ্ছ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

চিরযুবা কবি রবীন্দ্রনাথ এই 'পূরবী'র যুগেও তাঁহার জীবনদেবতার আহ্বান শুনিয়াছেন। বহুদিন পরে—একেবারে তাঁহার জীবনসায়াহ্নে উপনীত হইয়া কবি তাঁহার কাব্যলক্ষ্মী বা কাব্যের প্রেরণারূপিণী জীবনদেবতার আহ্বান শুনিয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলিয়াছেন—

দুয়ার বাহিরে যেমনি চাহিরে
মনে হলো যেন চিনি,
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,
ছিলে লীলা-সঙ্গিনী।

কাজে ফেলে মোরে চলে গেলে কোন্ দূরে,
মনে পড়ে গেল আজি বুঝি বন্ধুরে।
ডাকিলে আবার কবেকার চেনা সুরে
বাজাইলে কিঙ্কিণী।
বিস্মরণের গোধূলি-ক্ষণের
আলোতে তোমারে চিনি ॥

এই লীলাসঙ্গিনী জীবনদেবতা কবিকে যেন নবযৌবন দান করিয়াছেন। ইহার অস্তিত্ব কবি সমস্ত প্রকৃতির সৌন্দর্য-সম্ভারের মধ্যে উপলব্ধি করিতেছেন এবং তাঁহার চিত্ত আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। কারণ ইনিই নানা উপলক্ষ্যে ও নানা অবকাশে কবির জীবনকে স্পর্শ করিয়া কবিচিত্তকে বহুবার আনন্দে ও সৌন্দর্যে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন।

'পূরবী'র আহ্বান নামক কবিতায়ও রবীন্দ্রনাথের চিরন্তনী কবি-শক্তির কথা আছে। কবির জীবনদেবতাই যে কেবল কবিকে আহ্বান করিয়া নব নব সৃষ্টির জন্য চিরজীবন ডাকিয়া ফিরিয়াছেন তাহা নহে, কবিও প্রকাশের ব্যথায়—সৃষ্টির আকুলতায় এই লীলাসঙ্গিনী জীবনদেবতাকে খুঁজিয়া ফিরিয়াছেন আজীবন। তারপর যখন কবির সহিত কবি-প্রতিভার বা কবির অনুপ্রেরয়িত্রীর সাক্ষাৎ হইয়া যায় তখন তিনি নিজেকে কবি বলিয়া চিনিতে পারেন।

আমারে যে ডাক দেবে, এ জীবনে তারে বারম্বার
ফিরেছি ডাকিয়া।

সে-নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার,
থাকিয়া থাকিয়া।
দীপখানি তুলে ধ'রে, মুখে চেয়ে, ক্ষণকাল থামি'
চিনেছে আমারে।
তারি সেই চাওয়া, সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি
চিনি আপনারে॥

এই লীলাসঙ্গিনী জীবনদেবতার অনুপ্রেরণা পাইয়া কবির আত্মোপলব্ধি ঘটে, কবির কবিশক্তি সজাগ হইয়া উঠে। অব্যক্ত তখন ব্যক্ত হয়, অসাড়ের বুকে সাড়া জাগে।

তুমি মোরে চাও যবে, অব্যক্তের অখ্যাত আবাসে
আলো উঠে জ্ব'লে,
অসাড়ের সাড়া জাগে, নিশ্চল তুষার গ'লে আসে
নৃত্য-কলরোলে॥

কবির জীবনদেবতা বহুবার কবির প্রাণে অভিসারিকার বেশে আসিয়াছিলেন। এখানেও তিনি অভিসারিকার বেশে আসিয়া উপস্থিত। সেই প্রণয়াভিসারিকার প্রতীক্ষায় কবি বাণীহীন হইয়া একাকী জাগিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। কবির চিত্তপ্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে, তাঁহার মনোবীণা নীরব হইয়াছে—কিন্তু সেই অভিসারিকা লীলাসঙ্গিনী আসিয়া কবির চিত্ত-প্রদীপের শিখাটিকে জ্বালাইয়া তুলিবে, কবির বীণার তারে ঝঙ্কার তুলিবে। তখন প্রকাশের আনন্দে তাঁহার চিত্ত হইয়া উঠিবে উদ্বেল। এই অভিসারিকা আসিয়া কবির সৃজনী-প্রতিভাকে সার্থক ও সুন্দর করিয়া তুলিবে।

হে অভিসারিকা, তব বহুদূর পদধ্বনি লাগি'
আপনার মনে,
বাণীহীন প্রতীক্ষায় আমি আজ একা ব'সে জাগি,
নির্জন প্রাঙ্গণে।
দীপ চাহে তব শিখা, মৌনী বীণা ধেয়ায় তোমার
অঙ্গুলি-পরশ।
তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার
সঙ্গ-সুধারস ॥

কবির চিত্ত কবিত্বসুধা বর্ষণের জন্য কাঙাল হইয়া উঠিয়াছে। তাই তিনি বলিয়াছেন—

বর্ষণ-কাঙাল মোর মেঘের অন্তরে বহ্নি জ্বালো,
হে কাল-বৈশাখী।

মরণের কূলেও কবির এই কবিত্বরসধারা বর্ষণ ক্ষান্ত হইবে না। মরণের কূলেও কবির অন্তরের গহনবাসিনী নব-মানসী—যাঁহাকে তিনি 'শেষ পূজারিণী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন তিনি—কবিরই গানের অর্ঘ্য দিয়া বরণডালা সাজাইয়া রাখিয়াছেন। মরণোত্তর কালেও কবি কবি হইবার কামনা প্রকাশ করিয়াছেন। তখন পূরবীর রাগিণী প্রভাতী ভৈরবীতে পরিণত হইয়া সেই নবজীবনের নীরবতার বক্ষে নবীন ছন্দের উৎস ছুটাইয়া দিবে।

রচিয়া রাখেনি মোর প্রেয়সী কি বরণের ডালি
মরণের কূলে।

সেখানে কি পুষ্পবনে গীতহীন রজনীর তারা
নব জন্ম লভি'
এই নীরবের বক্ষে নব ছন্দে ছুটাবে ফোয়ারা
প্রভাতী ভৈরবী ॥

'পূরবী'তে আর দুইটি কবিতা আছে—'দোসর' ও 'খেলা'। কবি তাঁহার আশৈশবের দোসরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন—

দোসর আমার, দোসর ওগো, কোথা থেকে
কোন্ শিশুকাল হ'তে আমায় গেলে ডেকে।

'খেলা' কবিতায় কবি জীবনদেবতাকে খেলার সাথী বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। জীবন-সায়াহ্নে এই খেলার সাথীর আহ্বান শুনিয়া তিনি বলিতেছেন—

সন্ধ্যাবেলায় এ কোন্ খেলায় কর্‌লে নিমন্ত্রণ,
ওগো খেলার সাথী।
হঠাৎ কেন চম্‌কে তোলে শূন্য এ প্রাঙ্গণ
রঙীন শিখার বাতি।

এই আমন্ত্রণের ফলে কবি অনুভব করেন—

যৌবন বেদনা-রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি।

তিনি বলেন যে আজ এই অস্তগামী সূর্যের অরুণিমা দিয়া কি উদয়কালের ছবি আঁকিতে হইবে?—

অরুণ আভাস ছানিয়ে নিয়ে পদ্মবনের থেকে
রাঙিয়ে দিলে রাতি।

উদয় ছবি শেষ হবে কি অস্ত-সোনায় এঁকে
জ্বালিয়ে সাঁঝের বাতি ॥

কবির এই জীবনদেবতা চিরদিনই কবিকে বাঁধা-পথের নিয়ম মানিয়া চলিতে দেন নাই। চিরদিনই তিনি কবিকে ঘরছাড়া করাইয়া দিশাহারা ক্ষ্যাপার দলে নিরুদ্দেশ ছুটাছুটি করাইয়াছেন। তাই আজ আবার সেই জীবনদেবতার আহ্বানে কবি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে আজ আবার এই জীবনসন্ধ্যায় কি জীবনপ্রভাতের মতই কল্পনাবিলাসে দিনযাপন করিতে হইবে।

আমার কাছে কী চাও তুমি, ওগো খেলার গুরু,
কেমন খেলার ধারা।
চাও কী তুমি যেমন ক'রে হলো দিনের সুরু,
তেমনি হবে সারা।
সে-দিন ভোরে দেখেছিলাম প্রথম জেগে উঠে,
নিরুদ্দেশের পাগোল হাওয়ায় আগল গেছে টুটে,
কাজ-ভোলা সব ক্ষ্যাপার দলে তেম্‌নি আবার জুটে
কর্‌বে দিশে হারা।
স্বপন মৃগ ছুটিয়ে দিয়ে পিছনে তা'র ছুটে,
তেমনি হবো সারা।

জীবনদেবতা যখন কবির কাছে যে বেশেই আসিয়াছেন কবি কখনও তাঁহাকে নিরাশ করেন নাই। কবি চিরদিনই তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছেন। সকল শ্রান্তি ক্লান্তি উপেক্ষা করিয়া অনলস ভাবে সেই লীলাসঙ্গিনীর সহিত কখনও

বাঁশী বাজাইয়া ফিরিয়াছেন, কখনও বা জীবনদেবতার সুরের সহিত সুর মিলাইয়া তাঁহার বীণার সুর বাঁধিয়া লইয়াছেন। তাই এবারেও সেই খেলার সাথী জীবনদেবতার ডাকে কবি বলিতেছেন—

জানি জানি, তুমি আমার চাওনা পূজার মালা,
ওগো আমার খেলার সাথী।
এই জনহীন অঙ্গনেতে গন্ধ প্রদীপ জ্বালা,
নয় আরতির বাতি।

তোমার খেলায় আমার খেলা মিলিয়ে দেবো তবে
নিশীথিনীর স্তব্ধ সভায় তারার মহোৎসবে,
তোমার বীণার ধ্বনির সাথে আমার বাঁশির রবে
পূর্ণ হবে রাতি।
তোমার আলোয় আমার আলো মিলিয়ে খেলা হবে,
নয় আরতির বাতি॥

রবীন্দ্রনাথ বারংবার মনে করিয়াছেন—

যাত্রা হ'য়ে আসে সারা, আয়ুর পশ্চিম-পথশেষে
ঘনায় মৃত্যুর ছায়া এসে।

তথাপি কবির জীবনদেবতা তাঁহাকে ক্লান্তি মানিতে দেন নাই। তাঁহাকে দিয়া তিনি পুনঃ পুনঃ নব নব সৃষ্টি করাইয়া লইয়াছেন—কবির গানের অর্ঘ্য লইয়া বাণী-বন্দনার ডালি সাজাইয়া লইয়া তবে ছাড়িয়াছেন। তাই দেখি যে কবির জীবনদেবতা 'বিচিত্রা' যখন তাঁহাকে দিয়া 'দিনের অবসানে' বাণী-বন্দনার ডালি

সাজাইয়া লইলেন, তখনও কবি সেই 'বিচিত্রা'কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

তবু্ও কেন এনেছ ডালি দিনের অবসানে?
নিঃশেষিয়া নিবে কি ভরি' নিঃস্ব করা দানে?

যোগাযোগ

এই উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকাটি না জানিলে ইহার মধ্যে যে-সব সমস্যা উপস্থিত করা হইয়াছে, এবং সেগুলি মীমাংসার দিকে কতখানি অগ্রসর হইয়াছে তাহা বোঝা যাইবে না। তাই আমরা সংক্ষেপে গল্পের প্লটটি বলিতে বলিতে প্রসঙ্গত সমস্যা মীমাংসা ও চরিত্রগুলির বিশেষত্ব আলোচনা করিয়া যাইব। আমার এই আলোচনা সমালোচনা নয়, কবিগুরুর অসংখ্য শ্রদ্ধান্বিত পাঠকের মধ্যে একজনের মনে এই উপন্যাসখানি কেমন লাগিয়াছে তাহারই পরিচয়।

এক গ্রামে দুই জমিদারের বাস ছিল, ঘোষাল-বংশ আর চাটুজ্জে বংশ। উভয় বংশে রেষারেষি ছিল নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা লইয়া। 'ঘোষালরা স্পর্দ্ধা ক'রে চাটুজ্জেদের চেয়ে দু-হাত উঁচু প্রতিমা গড়েছিল।' ঘোষালেরা রাতারাতি বিসর্জনের রাস্তা জুড়িয়া তুলিল এক তোরণ, তাহাতে ঘোষালদের প্রতিমার মাথা গলে না। তাহার ফলে দু-পক্ষের অনেক লোকের মাথা ভাঙ্গিল। কাজেই মামলা-মোকদ্দমা হইতে হইতে উভয় পক্ষই জেরবার হইয়া গেল, বিশেষ করিয়া ঘোষালেরা। শেষকালে তাহাদের বংশমর্যাদা উচ্চ নয় বলিয়া তাহাদের সমাজেও হেয় করা হইল। তখন ঘোষালেরা সর্বস্বান্ত হইয়া দেশ ছাড়িয়া অন্য গ্রামে চলিয়া

গেল। সেই ঘোষাল-বংশের আনন্দ ঘোষাল রজবপুরের আড়তদারদের মুহুরী হইল। তাহার ছেলে মধুসূদন ছেলেবেলা হইতেই আড়তে মানুষ হইয়া ব্যবসার হাটহদ্দ জানিয়া লইল, আর লেখাপড়া ছাড়িয়া ব্যবসায়ে ঢুকিয়া ক্রমে মহারাজ হইয়া উঠিল। মধুসূদন ছেলেবেলা হইতে হিসাবে দক্ষ, দৃঢ়স্বভাব, এক কথার মানুষ, যাহা ধরে বা বলে তাহা করে। সে অর্থসঞ্চয়ে এমন মন দিলে যে তাহার মা পুত্রবধূর মুখদর্শনের আশা ত্যাগ করিয়াই পরলোকে প্রস্থান করিলেন। যখন মধুসূদন কারবার খুব ফলাও করিয়া তুলিয়া রাজা মহারাজা খেতাব পাইয়া সমাজে লোকমান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল, তখন সে বলিল—এইবার বিবাহের ফুরসৎ হইয়াছে।

নানা জায়গা হইতে বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। মধুসূদন চোখ পাকাইয়া বলিল—ঐ চাটুজ্জেদের মেয়ে চাই। মধুসূদন তাহার পূর্বপুরুষের লাঞ্ছনার কথা এক দিনও ভোলে নাই। যাহারা তাহাদের কুলের খোঁটা দিয়া দেশছাড়া করিয়াছিল, চাই তাহাদেরই ঘরের মেয়ে। মধুসূদন পণ করিয়াছিল—টাকার জোরে সে চাটুজ্জেদের কুলগর্ব খর্ব করিয়া ছাড়িবে।

নুরনগরের চাটুজ্জেদের অবস্থাও এখন ভাল নয়, তাহাদের জমিদারী দেনায় জড়াইয়াছে। তাহাদের পরিবারের মধ্যেও ভাগাভাগি হইয়া গিয়াছে। একভাগে আছে দুই ভাই—বিপ্রদাস আর সুবোধ, আর পাঁচ বোন। চার বোনের বিবাহ হইয়া

গিয়াছে—তাহাদের বাপ মা বাঁচিয়া থাকিতেই তাঁহারা অনেক পণ দিয়া মেয়েদের বিবাহ দিয়া গিয়াছেন। ছোট বোন কুমুদিনীর বিবাহ হইবার আগেই তাহার বাবার অসচ্চরিত্রতার জন্য তাহার মা রাগ করিয়া বৃন্দাবন চলিয়া যান। সেই শোকে কুমুদিনীর বাবা অল্পদিনের মধ্যেই মারা যান, এবং তাহার অল্পদিন পরেই তাহার মাও স্বামীর সহগমন করেন। তখন তাহার রক্ষণ ও শিক্ষার ভার পড়ে তাহার বড়দাদা বিপ্রদাসের উপর। বিপ্রদাস বোনকে লেখাপড়া গান-বাজনা বন্দুক ছোঁড়া প্রভৃতি বহুবিষয়ে সুশিক্ষিতা করিয়া তোলেন। কুমুদিনীর বয়স হইয়াছে উনিশ। এখন তাহার বিবাহ দিতে হইবে। অথচ চাটুজ্জে-বংশের মেয়ের বিবাহের উপযুক্ত পণের টাকার সঙ্গতি তখন বিপ্রদাসের নাই। এই সময় হঠাৎ বিপ্রদাসের মাড়োয়ারী মহাজন বিপ্রদাসকে টাকার তাগাদা দিয়া বসিল, এবং সেই সময়েই একজন বন্ধু অনেক দিন পরে হঠাৎ আসিয়া বিপ্রদাসকে পরামর্শ দিল যে মহারাজ মধুসূদনের কাছ হইতে এক থোকে এগার লক্ষ টাকা ধার লইয়া সে তাহার সব খুচরা দেনা মিটাইয়া ফেলুক। বিপ্রদাস তাহাই করিল। ছোটভাই সুবোধ বলিল এখন উপার্জনের পথ দেখিতে হইবে, সে বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিবে। সে গেল বিলাত। মাড়োয়ারীর তাগাদা আর বিপ্রদাসের বন্ধুর অকস্মাৎ আবির্ভাব হয়ত কৌশলী মধুসূদনের কৌটিল্য-নীতিরই ফল।

কুমুদিনীর বিবাহের পণ জোটানো ও পাত্র জোটানোর কথা কল্পনা করিতেই তাহার দাদা বিপ্রদাসের আতঙ্ক হয়। তাই কুমুদিনী নিজের জন্য নিজে সঙ্কুচিত। তাহার বিশ্বাস সে অপয়া। সে মনে মনে কেবল ভাবে—'কোথায় আমার রাজপুত্র, কোথায় তোমার সাতরাজার ধন মাণিক, বাঁচাও আমার ভাইদের, আমি চিরদিন তোমার দাসী হ'য়ে থাক্‌ব।'

কুমুদিনী 'বংশের দুর্গতির জন্যে নিজেকে যতই অপরাধী করে, ততই হৃদয়ের সুধাপাত্র উপুড় ক'রে ভাইদের ওর ভালবাসা দেয়,—কঠিন দুঃখে নেঙ্‌ড়ানো ওর ভালবাসা। কমুর 'পরে তাদের কর্তব্য করতে পারছে না ব'লে ওর ভাইরাও বড় ব্যথার সঙ্গে কুমুকে তাদের স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেছে।'

বিপ্রদাস সাবেক চাল বজায় রাখা কঠিন দেখিয়া কুমুদিনীকে লইয়া কলকাতায় আসিলেন। দেশ ছাড়িয়া কুমুদিনীর মন খাঁ খাঁ করে। বিপ্রদাস বেশী করিয়া বোনকে সাহিত্য এসরাজ বন্দুক ছোঁড়া শেখান, একসঙ্গে দাবা খেলেন। এখানে আসিয়া ভাই-বোন পরস্পরের সঙ্গী হইল। কিন্তু কুমুদিনীর মনটা জন্ম-একলা। বিপ্রদাসও নানা চিন্তায় গম্ভীর প্রশান্ত।

কুমুদিনী 'দেখ্‌তে সে সুন্দরী, লম্বা ছিপ্‌ছিপে, যেন রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ড; চোখ বড় না হোক একেবারে নিবিড় কালো, আর একটি নিখুঁত রেখায় যেন ফুলের পাপ্‌ড়ি দিয়ে

তৈরী। রঙ্ শাঁখের মতন চিকণ গৌর ; নিটোল দু-খানি হাত ; সে হাতের সেবা কমলার বরদান,—কৃতজ্ঞ হ'য়ে গ্রহণ করতে হয়। সমস্ত মুখে একটি সকরুণ ধৈর্যের ভাব। এক রকমের সৌন্দর্য আছে তাকে মনে হয় যেন একটা দৈব অবির্ভাব, পৃথিবীর সাধারণ ঘটনার চেয়ে অসাধারণ পরিমাণে বেশী। কুমুদিনী ঘরে লেখাপড়া করেছে। বাইরের পরিচয় নেই বল্‌লেই হয়। পুরানো নূতন দুই কালের আলো-আঁধারে তার বাস।'

তাহার দাদা তাহাকে দেখিয়া ভাবেন—'ও যে চাঁদের আলোর টুক্‌রো, দৈন্যের অন্ধকারকে একা মধুর ক'রে রেখেছে।'

আর 'বিপ্রদাসের দেবতার মত রূপ, বীরের মত তেজস্বী মূর্তি, তাপসের মত শান্ত মুখশ্রী, তার সঙ্গে একটি বিষাদের নম্রতা। তাঁর মুখে সেই বিষাদ তাঁর অন্তরের মহত্ত্বের ছায়া, ধৈর্যের আশ্চর্য গভীরতা। তখনকার কালে শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত পজিটিভিজ্‌ম্ তাঁর ধর্ম ছিল, দেবতাকে বাইরে থেকে প্রণাম করা তাঁর অভ্যাস ছিল না, অথচ দেবতা আপনিই তাঁর জীবন পূর্ণ ক'রে আবির্ভূত ছিলেন।' অতি ক্রোধের সময়েও তাঁহার শান্ত কণ্ঠস্বর, মুখের মধ্যে উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ পাইত না।

বিপ্রদাসের ভাই সুবোধ বিলাত গিয়া অপব্যয় করিতেছে, আর ক্রমাগত দাদার কাছে টাকা চাহিয়া পাঠাইতেছে।

বিপ্রদাস ভাইয়ের অবিবেচনায় বিব্রত ও ব্যথিত হয়, কিন্তু কষ্ট করিয়া টাকা পাঠায়। একবার সুবোধ একথোকে দেড়-শ পাউণ্ড্ চাহিয়া পাঠাইল। দাদাকে চিন্তিত দেখিয়া কুমুদিনী ব্যাপার জানিতে পারিল, এবং তাহার মায়ের গহনা বেচিয়া ছোট দাদাকে টাকা পাঠাইতে অনুরোধ করিল। কিন্তু সে গহনা বিপ্রদাস কুমুদিনীর বিবাহের জন্য সম্বল করিয়া রাখিয়াছিল। বিপ্রদাস টাকা পাঠাইতে পারিবে না লেখাতে সুবোধ লিখিল তাহার অংশের জমিদারী বিক্রয় করিয়া টাকা পাঠাইয়া দিতে। সুবোধের এই প্রস্তাব বিপ্রদাস আর কুমুদিনীর বুকে বাজিল। বিপ্রদাস নিজের তালুক পত্তনী দিয়া টাকা পাঠাইল।

এমন সময় আসিল মধুসূদনের ঘটক। বিপ্রদাস বেশী বয়সী পাত্রে বোন সম্প্রদান করিতে নারাজ হইল। কুমুদিনী ভাবে তাহার দিদিদের কথা। তাহারা তো তাহাদের স্বামী বাছিয়া লয় নাই, মানিয়া লইয়াছে,—যেমন করিয়া মা মানিয়া লয় ছেলেকে। কুমুদিনী ভাবে সতীসাধ্বীদের কথা যাহারা নির্বিচারে স্বামীর সব আচরণ সহ্য করে। সে কদিন ভাবিয়া ভাবিয়া অচেনা অদেখা মধুসূদনকেই পতিত্বে বরণ করিয়া ফেলিল। সে দেবতার কাছে সঙ্কেত মানত করিয়া মনে করিল সে দৈবসঙ্কেতে তাহার মনোনয়নের সমর্থনই পাইয়াছে। তাহার দাদা তাহার মত জিজ্ঞাসা করিলে সে জোর দিয়া বলিল—সে মধুসূদনকে ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না।

সম্বন্ধ অগত্যা পাকা হইল। কুমুদিনী খুশী। তাহার অন্তরে বাহিরে যেন একটা নূতন প্রাণের রঙ্ লাগিল।

কিন্তু মধুসূদন মহাসমারোহে নিজের লোকজন দিয়া এক মধুপুরী নির্মাণ করাইয়া ঐশ্বর্যের রাজসিক আড়ম্বরে চাটুজ্জেদের উপর টেক্কা দিতে লাগিয়া গেল। সে বিপ্রদাসকে খাটো করিয়া নিজের বাহাদুরী লইবার যত রকম চেষ্টা করে তাহাতে কুমুদিনীর কষ্ট হয়। চাটুজ্জেরা যখন মধুসূদনের ঐশ্বর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, তখন তাহারা মধুসূদনের বংশমর্যাদার হীনতা লইয়া তাহাকে খোঁটা দিতে লাগিল। তবু কি পরাজয়ের গ্লানি মিটিতে চায়? মধুসূদনের জাতকুলের কথাটাকে কুমুদিনী তাহার ভক্তি দিয়া চাপা দিয়াছিল। কিন্তু মধুসূদনের ধনের বড়াই করিয়া শ্বশুর-কুলকে খাটো করার নীচতা দেখিয়া তাহার মন বিষাদে ভরিয়া উঠিল। ঘোষালদের লজ্জায় আজ যেন উহারই সব চেয়ে বেশী লজ্জা।

কুমুদিনী দাদার সামনে আসিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। বিপ্রদাস বলিলেন—'কুমুদিনীর মনে যদি কোনও খট্‌কা থাকে তবে তিনি বিয়ে এখনও ভেঙে দিতে পারেন।' কুমুদিনী বলিল—'ছি ছি সে কি হয়!' এখন থেকে কুমুদিনী মনে মনে জোরের সঙ্গে জপিতে লাগিল, তিনি ভালই হোন মন্দই হোন তিনি আমার পরম গতি।

কিন্তু মধুসূদনের ব্যবহার ক্রমশই অভদ্র উদ্ধত হইয়া

উঠিতে লাগিল। কুমুদিনীর ভাবে আর বাস্তবে দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। বাল্যকালে যখন সে পতিকামনায় শিবের পূজা করিয়াছে, তখন পতির ধ্যানের মধ্যে সেই মহাতপস্বী শিবকেই দেখিয়াছে। সাধ্বী নারীর আদর্শ রূপে সে আপন মাকেই জানিত—কি স্নিগ্ধ শান্ত কমনীয়তা, কত ধৈর্য ; যদিও তাঁহার স্বামীর দিকে ব্যবহারের ত্রুটি ছিল, চরিত্রের স্খলন ছিল। দময়ন্তীর মত তাহারও মনের মধ্যে কি নিশ্চিত বার্তা আসিয়া পৌঁছে নাই যে মধুসূদনকেই তাহার বরণ করিতে হইবে? বরণের আয়োজন সব প্রস্তুতই ছিল, রাজাও আসিলেন কিন্তু মনের মানুষের সঙ্গে বাহিরের মানুষের মিল হইল কই? রূপেতেও বাধে না, বয়সেও বাধে না, কিন্তু সত্যকার রাজা কোথায়?

বিবাহ হইয়া গেল। বিপ্রদাস অসুখে শয্যাগত, তিনি মধুসূদনের অভদ্র ব্যবহারের কোন খবরই পাইলেন না। কুমুদিনী শুভদৃষ্টির সময় ভাল করিয়া বরের দিকে চাহিতেই পারিল না। মধুসূদনের ব্যবহারে তাহার কেমন ভয় ধরিয়া গিয়াছে।

মধুসূদন দেখিতে কুশ্রী নয়, কিন্তু বড় কঠিন। কালো মুখের মধ্যে মস্ত বড় বাঁকা নাক। প্রশস্ত কপাল, ঘন ভ্রূ। গোঁপদাড়ি কামানো, ঠোঁট চাপা, চিবুক ভারী, কড়া চুল কাফ্রিদের মত কোঁকড়া, মাথার তেলো ঘেঁষিয়া ছোঁটা। খুব আঁটশাঁট শরীর, কেবল দুই রগের কাছে চুলে পাক ধরিয়াছে।

বেঁটে, মাথায় প্রায় কুমুদিনীর সমান। হাত দুটা রোমশ, দেহের তুলনায় খাটো। সবশুদ্ধ মনে হয় মানুষটা একেবারে নিরেট, মাথা হইতে পা পর্যন্ত সর্বদাই কি একটা প্রতিজ্ঞা যেন গুলি পাকাইয়া আছে। যেন ভাগ্যদেবতার কামান হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া একাগ্রভাবে চলিয়াছে একটা একগুঁয়ে গোলা। দেখিলেই বোঝা যায় বাজে কথা, বাজে বিষয়, বাজে মানুষের প্রতি মন দিবার উহার একটুও অবকাশ নাই। মধুসূদনের সাজটা ছিল বিচিত্র, বাড়ির চাকরদাসীরা অভিভূত হইবে এমনতর বেশ—ডোরাকাটা বিলিতি শার্টের উপর একটা রঙীন ফুলকাটা সিল্কের ওয়েষ্ট-কোট, কাঁধের উপর পাটকরা চাদর, যত্নে কোঁচানো কালাপেড়ে শান্তিপুরে ধুতি, বার্নিশ করা কালো দরবারী জুতো, বড় বড় হীরে পান্নাওয়ালা আঙ্‌টিতে আঙুল ঝলমল করিতেছে। প্রশান্ত উদরের পরিধি বেষ্টন করিয়া মোটা সোনার ঘড়ির শিকল, হাতে একটি সৌখীন লাঠি, তার সোনার হাতলটি হাতীর মুণ্ডের আকারে নানা জহরতে খচিত।

প্রথম মিলনেই বরবধূর বিচ্ছেদ সুরু হইল। ফুলশয্যার রাত্রে কুমুদিনী লজ্জাকম্পিত কণ্ঠে স্বামীর কাছে প্রার্থনা জানাইল তাহার দাদার অসুখ, আর দুটো দিন সে বাপের বাড়ী থাকিয়া যাইতে চায়। তাহার প্রার্থনা না-মঞ্জুর হইল। কলিকাতায় নামিয়াই এক গাড়ীতে যাইতে যাইতে মধুসূদন দেখিল কুমুদিনীর হাতে একটা নীলার আঙ্‌টি। অমনি সে

হুকুম করিল এ আঙ্‌টি তাহার আর পরা চলিবে না। মধুসূদন কেবল কুমুদিনীর আঙ্‌টি খুলাইয়াই নিরস্ত হইল না, তাহার দাদার দেওয়া আঙ্‌টিটাকেও সে কাড়িয়া লইল।

কুমুদিনী স্বামীর কাছে কেবলই হুকুম শোনে, প্রীতি পরিচয় পায় না। আর সে ভাবে—যেমন ক'রে অভিসারে বেরোয় তেমনি ক'রেই বেরিয়েছি, অন্ধকার রাত্রিকে অন্ধকার বলেই মনে হয় নি। আজ আলোতেই চোখ মেলে অন্তরেই বা কি দেখলুম, বাইরেই বা কি দেখ্‌ছি? এখন বছরের পর বছর, মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটবে কি ক'রে? এতদিন কুমুদিনী স্বামীর বয়স বা রূপ লইয়া কোনও চিন্তাই করে নাই। সাধারণত যে ভালবাসা লইয়া স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ সত্য হয়, যাহার মধ্যে রূপগুণ দেহমন সমস্তই মিলিয়া আছে, তাহার যে প্রয়োজন আছে একথা কুমুদিনী ভাবেও নাই। এখন সে যে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বামীর কাছে আত্মসমর্পণ করিতে পারিতেছে না তাহা মনে হইতেছে মহাপাপ, কিন্তু সে পাপেও তাহার তেমন ভয় হইতেছে না, যেমন হইতেছে শ্রদ্ধাহীন আত্মসমর্পণের গ্লানির কথা মনে করিয়া।

মধুসূদনের বাড়ির মেয়েদের কাছ হইতেও কুমুদিনী বিশেষ কোনও মমতা পাইল না, তাহারা সবাই তাহার কেবল সমালোচনাই করে। এই মেয়েলী সমালোচনার বিবরণটি চমৎকার। তাহা আর উদ্ধার করিলাম না। সেই বাড়িতে কেবল মধুসূদনের ছোট ভাই নবীন, আর তাহার স্ত্রী মোতির মা

কুমুদিনীর প্রকৃত মর্যাদা বুঝিয়া তাহাকে শ্রদ্ধা যত্ন করিতে লাগিল।

মোতির মা কিন্তু এইটুকু বুঝিতে পারে না যে স্ত্রী হইয়া স্বামীর কাছে আত্মোৎসর্গ করার মধ্যে বাধা কোথায় থাকিতে পারে! সে ত সেকেলে ধারণার বশীভূতা গৃহস্থ বধূ।

মধুসূদনের পক্ষে কুমু হইল একটি নূতন আবিষ্কার। স্ত্রী-জাতির পরিচয় পায় এ পর্যন্ত এমন অবকাশ এই কেজো মানুষটির অল্পই ছিল। মধুসূদন মেয়েদের অতি সংক্ষেপে দেখিয়াছে ঘরের বউ-ঝি-দের মধ্যে। উহার স্ত্রীও যে জগতের সেই অকিঞ্চিৎকর বিভাগে স্থান পাইবে এবং দৈনিক গার্হস্থ্যের তুচ্ছতায় ছায়াছন্ন হইয়া কর্তাদের কটাক্ষ-চালিত মেয়েলী জীবন-যাত্রা অতিবাহিত করিবে, ইহার বেশী সে কিছুই ভাবে নাই। স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার করিবারও যে একটা কলানৈপুণ্য আছে, তাহার মধ্যেও যে একটা পাওয়া বা হারাইবার কঠিন সমস্যা থাকিতে পারে, এ কথা তাহার হিসাব-দক্ষ সতর্ক মস্তিষ্কের কোনো কোণে স্থান পায় নাই। মধুসূদন তাহার অবচেতন মনে নিজের অগোচরে কুমুদিনীকে একরকম অস্পষ্ট-ভাবে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু মধুসূদনও স্বামীগিরির সেকেলে ধারণাই মনে পুষিয়া আসিয়াছে, আর তাহার উপরে আবার সে সকলের উপর প্রভুত্ব করিয়া অভ্যস্ত,—সে স্বামী, সকলের উপরে,—এ বোধ তাহার অস্থিমজ্জাগত হইয়া আছে। তাই সে ভাবিল—আমিই যে উহার

একমাত্র, একথাটা যত শীঘ্র হউক কুমুদিনীকে জানান দেওয়া চাই।

স্বামীর ব্যবহারে কুমুদিনীর যে পরিমাণ কষ্ট না হইতেছিল, তাহার চেয়ে বেশী কষ্ট বোধ হইতেছিল তাহার নিজের কাছে নিজের অপমানে। এই কষ্টটা বুঝিতে পারিতেছিল মোতির মা। সে ভাবিল—আমাদের যখন বিবাহ হইয়াছিল তখম আমরা ত কচি খুকী ছিলাম, মন বলিয়া একটা বালাই ছিল না। কিন্তু কুমুদিনী বেশী বয়সে লেখাপড়া শিখিয়া স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছে। এ মেয়ের পক্ষে অপরিচিত একজন পুরুষকে অকস্মাৎ স্বামী বলিয়া মানিয়া লওয়া বিড়ম্বনা। বড়ঠাকুর এখনও উহার পর। আপন হইতে অনেক সময় লাগে। ধন পাইতে বড়ঠাকুরের কতকাল লাগিল, আর মন পাইতে দু-দিন সবুর সহিবে না? সেই লক্ষ্মীর দ্বারে হাঁটাহাঁটি করিয়া মরিতে হইয়াছে। আর এই লক্ষ্মীর দ্বারে একবার হাত পাতিতে হইবে না?

কুমুদিনী স্বামীর ব্যবহারে মর্মাহত হইয়া মনে করিল এ বাড়িতে আমার যদি বধূর অধিকার না-ই থাকে, তবে আমি এ বাড়িতে থাকি কিসের সম্পর্কে? তাই সে বাড়ির দাসীপনা করিতে নিযুক্ত হইল। সে আলো-বাতি রাখার ময়লা ঘরের এক কোণে নিজের বাসস্থান করিয়া লইল।

মধুসূদন কিন্তু মনে মনে কুমুদিনীর জন্য প্রতীক্ষা করে। রাত্রে উঠিয়া চুপি চুপি যায় কুমুদিনীর ঘরে, সে কি করিতেছে

দেখিতে। সে গিয়া একদিন দেখিল কুমুদিনী দিব্য নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছে। মধুসূদনের মনে হইল যে তাহার যেমন ঘুম নাই, কুমুদিনীরও তেমনি ঘুম না থাকাই উচিত ছিল। কুমুদিনীর মুখে লণ্ঠনের আলো পড়িতেই সে একটু নড়িল। গৃহস্থের জাগার লক্ষণ দেখিয়া চোর যেমন করিয়া পালায়, মধুসূদন তেমনি তাড়াতাড়ি পালাইল। তাহার ভয় হইল পাছে কুমুদিনী উহার পরাভব দেখিয়া মনে মনে হাসে। মধুসূদন বুঝিতে লাগিল যে তাহার দিনের চরিত্রের সঙ্গে রাতের চরিত্রের অনেকটা প্রভেদ ঘটিতেছে। এই রাত্রি দুটার সময় চারিদিকে লোকের দৃষ্টি বলিয়া যখন কিছুই নাই, তখন কুমুদিনীর কাছে মনে মনে হার মানা তাহার কাছে অস্বীকৃত রহিল না। কুমুদিনীকে কঠিনভাবে শাসন করার শক্তি মধুসূদন হারাইয়া ফেলিয়াছে। এখন তাহার নিজের তরফে যে অপূর্ণতা তাহাই তাহাকে পীড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। চাটুজ্জেদের ঘরের মেয়েকে সে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল চাটুজ্জেদের পরাজিত করিবে বলিয়া। কিন্তু সে যে এমন মেয়ে পাইবে বিধাতা আগে থাকিতেই যাহার কাছে হার মানাইয়া রাখিয়া দিয়াছেন, ইহা সে মনেও ভাবে নাই। অথচ এখন সে একথা বলিবারও জোর মনে পাইতেছে না যে তাহার ভাগ্যে একজন সাধারণ মেয়ে হইলেই ভাল হইত যাহার উপর তাহার শাসন খাটিত। একদিন সে কুমুদিনীর সামনে নবীন আর মোতির মাকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, 'কাল থেকে বড়বৌয়ের

সেবায় আমি তোমাদের নিযুক্ত করলুম।' মধুসূদন কুমুকে বুঝাইয়া দিল, তোমার কাছে আমি অসঙ্কোচে হার মানিতেছি।

এইবার আবার কুমুদিনীর পালা আরম্ভ হইল। সে ভাবিতে লাগিল—ইহার বদলে কি আছে তাহার দিবার? বাহির হইতে জীবনে যখন বাধা আসে তখন লড়াই করিবার জোর পাওয়া যায়, তখন দেবতাই হন সহায়। হঠাৎ সেই বাহিরের বিরুদ্ধতা একেবারে নিরস্ত হইলে যুদ্ধ থামে, কিন্তু সন্ধি হইতে চায় না।

মধুসূদন যেদিন কুমুদিনীর আংটি হরণ করিয়াছিল সেদিন উহার সাহস ছিল। সে মনে করিয়াছিল কুমুদিনী সাধারণ মেয়েদের মতন সহজেই শাসনের অধীন হইবে। কিন্তু সে এখন দেখিতেছে কুমুদিনী সহজ মেয়ে মোটেই নয়। এখন মধুসূদনের মনে হইতে লাগিল—কুমুদিনীকে নিজের জীবনের সঙ্গে শক্ত বাঁধনে জড়াইবার একটি মাত্র রাস্তা আছে, সে কেবল সন্তানের মায়ের রাস্তা। সেই কল্পনাতেই এখন তাহার মন ব্যগ্র।

কুমুদিনী যাহাকে ভালবাসে নাই তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করে, হোক না সে তাহার বিবাহের মন্ত্রপড়া স্বামী। কুমু করে বিদ্রোহ, আর দোষ পড়ে মোতির মার ঘাড়ে। কারণ মধুসূদন মনে করে মোতির মা যেহেতু কুমুদিনীকে আদর যত্ন করে, সেই হেতু কুমুদিনীকে বশ মানানো যাইতেছে না। তাহার শাসন প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে। তাই সে মোতির মাকে বাড়ি হইতে

বিদায় করিয়া দিবার কল্পনা করে, কিন্তু মনের মধ্যে জোর পায় না। সে জানে যে তাহার সংসারে মোতির মার গৃহিণীপনা নিতান্ত অপরিহার্য। অথচ যে-বিবাহিত স্ত্রীর দেহ-মনের উপর তাহার সম্পূর্ণ দাবী, সেও তাহার পক্ষে নিরতিশয় দুর্গম হইয়া থাকে, ইহাও তাহার সহ্য হইতেছিল না। মধুসূদনের সকল কাজে শৈথিল্য আর অবহেলা দেখা দিতে লাগিল। সে নিজে এবং অপর সকলে ইহা দেখিয়া আশ্চর্য হইতে লাগিল।

কুমুদিনী নিরন্তর তাহার অন্তরের ঠাকুরের কাছে কর্তব্য নির্ধারণের নির্দেশ চায়। মধুসূদন যেদিন ভাবিল, আমি নিজের মান খর্ব করিয়া কুমুর মান ভাঙিব, এবং তাহার হাতে ধরিয়া মিনতি করিল, সেইদিন কুমুদিনী পড়িল মুস্কিলে। মধুসূদন যখন ক্ষুদ্র হয়, কঠোর হয়, তখন সেটা সহ্য করা কুমুদিনীর পক্ষে তত কঠিন নয়। কিন্তু আজ মধুসূদনের এই নম্রতা, এই তাহার নিজেকে খর্ব করা সম্বন্ধে কুমু যে কি করিবে তাহা সে স্থির করিতে পারে না। হৃদয়ের যে দান লইয়া সে আসিয়াছিল তাহা তো স্খলিত হইয়া ধূলায় পড়িয়া গিয়াছে। তথাপি কুমু স্বামীর হুকুম মানে, কিন্তু তাহার আন্তরিক সতীত্ব তাহাকে ধিক্কার দেয়, সে তাহার ঠাকুরের কাছে নালিশ করে তাহার ঠাকুরেরই বিরুদ্ধে। কেন তিনি তাহাকে এই অশুচিতা হইতে বাঁচিবার পথ দেখাইয়া দিতেছেন না। তাহার মনে হইতেছে একটা কালো কঠোর ক্ষুধিত জরা বাহির হইতে তাহাকে যেন গ্রাস করিতেছে। যে পরিণত বয়স শান্ত স্নিগ্ধ সুগম্ভীর,

মধুসূদনের তাহা নহে ; যাহা লালায়িত, যাহার প্রেম বিষয়াশক্তিরই সজাতীয়, তাহারই স্বেদাক্ত স্পর্শে কুমুর এত বিতৃষ্ণা। কুমুদিনী এই অশুচিতা হইতে পালাইবার একমাত্র উপায় দেখে শিশু মোতির সংসর্গে। এই শিশু মোতি তাহার জেঠিমাকে পরিপূর্ণভাবে ভালবাসে।

কুমুদিনী মোতির সাহচর্যে নিজের অশুচিতা শোধন করিয়া লইতে চায় বলিয়া মধুসূদন বালকটির উপরও রূঢ় ব্যবহার করে, আর তাহার সকল আঘাত গিয়া লাগে কুমুদিনীকে, আর সে হইয়া উঠে আরও অপনার মধ্যে আপনি অবরুদ্ধ। মধুসূদন বুঝিতে পারে না যে, সে যাহা চায় তাহা পাইবার বিরুদ্ধে উহার স্বভাবের মধ্যেই একটা মস্ত বাধা রহিয়াছে।

মধু যখন হুকুম করিয়া কুমুদিনীর প্রেম আদায় করিতে চায়, তখন একদিন কুমুদিনী দেখিল নবীন আর মোতির মার মধ্যে প্রেমলীলা। তাহাদের সেই প্রেমলীলা কেমন সহজ আর সুশ্রী, আর তাহার পাশে মধুসূদনের ব্যবহার কি বিশ্রী কুৎসিত বীভৎস।

মধুসূদন দেখিয়াছে কুমুদিনীর দাদা বিপ্রদাসের মধ্যে ঔদ্ধত্য একটুও নাই, আছে একটা দূরত্ব। বিপ্রদাসের কাছে মধুসূদন মনে মনে খাটো হইয়া থাকে, তাহাতে তাহার রাগ ধরে। সেই একই সূক্ষ্ম কারণে কুমুর উপরেও মধুসূদন জোর করিতে পারিতেছে না—আপন সংসারে যেখানে

সবচেয়ে তাহার কর্তৃত্ব করিবার অধিকার সেইখানেই সে যেন সবচেয়ে হটিয়া গিয়াছে। সেই জন্যই কুমুর প্রতি তাহার রাগের বদলে আকর্ষণ দুর্নিবার বেগে প্রবল হইয়া উঠিতেছে, আর রাগ বাড়িতেছে কুমুদিনীর দাদা বিপ্রদাসের উপর। কারণ মধুসূদনের সন্দেহ যে বিপ্রদাসের আদর্শ আর শিক্ষাতেই কুমুদিনী এমন ভাবে গর্বিত হইয়া উঠিতেছে। তাহার সন্দেহ অমূলকও নহে।

মধুসূদন হিংস্র হইয়া বিপ্রদাসকে পীড়ন করিতে লাগিল। তাহার মনে মনে এই ছিল যে, বিপ্রদাসকে শাস্তি দিলে কুমুদিনীকেও শাস্তি দেওয়া হইবে। বিপ্রদাস শান্তভাবে মধুর সব কুব্যবহার সহ্য করিতে লাগিলেন। বিপ্রদাস বনেদী ঘরের অভিজাত ভদ্রলোক, তাঁহার কাছে হীনতা কপটতার লেশ মাত্র ছিল না। তাঁহার চরিত্র ঔদার্যে মহৎ, পৌরুষে দৃঢ়, তাঁহার ছিল নিজেদের ক্ষতি করিয়াও অক্ষত সম্মানের গৌরব রক্ষা, অক্ষত সঞ্চয়ের অহঙ্কার প্রচার নহে।

মধুসূদনের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহা কুমুকে কেবল যে আঘাত করিয়াছে তাহা নহে, উহাকে গভীর লজ্জা দিয়াছে। উহার মনে হইয়াছে সেটা যেন অশ্লীল। মধুসূদন তাহার জীবনের আরম্ভে একদিন দুঃসহ ভাবেই গরীব ছিল, সেই জন্যই পয়সার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সে কথায় কথায় যে মত ব্যক্ত করিত সেই গর্বোক্তির মধ্যে তাহার

রক্তগত দারিদ্র্যের একটা হীনতা ছিল। এই পয়সা-পূজার কথা মধুসূদন বার বার তুলিত কুমুর পিতৃকুলকে খোঁটা দিবার জন্য। উহার সেই স্বাভাবিক ইতরতায় ভাষার কর্কশতায়, দাম্ভিক অসৌজন্যে, সবসুদ্ধ মধুসূদনের দেহ-মনের ও উহার সংসারের অশোভনতায় প্রত্যহই কুমুর সমস্ত শরীর মনকে সঙ্কুচিত করিয়া তুলিতেছে। স্বামীপূজার কর্তব্যতার সম্বন্ধে সংস্কারটাকে বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য উহার চেষ্টার অন্ত ছিল না, কিন্তু তাহার যে কত বড় হার হইয়াছে তাহা ইহার আগে এমন করিয়া সে বোঝে নাই।

মধুসূদন যখন কুমুদিনীর সঙ্গে মিলনটাকে সহজ করিয়া তুলিতে কিছুতেই পারিল না, তখন সে মন দিল অন্যদিকে। মধুসূদনের বাড়ীতে তাহার দাদার এক বিধবা বৌ থাকিত তাহার নাম শ্যামাসুন্দরী। শ্যামা ধনী ঠাকুরপোকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সদাই ব্যগ্র, কায়মনোবাক্যে সে তাহাকে সেবা করিতে প্রস্তুত। মধুসূদন এতদিন তাহাকে আমল দেয় নাই, প্রশ্রয় দেয় নাই। কিন্তু এখন কুমুকে শাস্তি দিবার জন্য মধু তাহার দ্বারস্থ হইল। শ্যামা কৃতার্থ হইয়া গেল।

এই শ্যামাসুন্দরী পরিণত বয়সী আঁটসাঁট গড়নের শ্যামবর্ণ একটি সুন্দরী বিধবা—মোটা নহে কিন্তু পরিপুষ্ট শরীর নিজেকে যেন বেশ একটু ঘোষণা করিতেছে। একখানি সাদা শাড়ীর বেশী গায়ে কাপড় নাই, কিন্তু দেখিয়া মনে

হয় সর্বদাই পরিচ্ছন্ন। বয়স যৌবনের প্রায় প্রান্তে আসিয়াছে, কিন্তু এখনও জরা আক্রমণ করে নাই। তাহার ঘন ভ্রূর নীচে তীক্ষ্ণ কালো চোখ অল্প একটু দেখিয়াই সমস্তটা দেখিয়া লয়। তাহার টস্‌টসে ঠোঁটদুটির মধ্যে একটা ভাব আছে যেন অনেক কথাই সে চাপিয়া রাখিয়াছে। সংসার তাহাকে বেশী কিছু রস দেয় নাই, তবু সে ভরা। সে নিজেকে দামী বলিয়াই জানে, সে কৃপণও নহে। কিন্তু তাহার মহার্ঘতা ব্যবহারে লাগিল না বলিয়া নিজের আশ-পাশের উপর তাহার একটা অহঙ্কৃত অশ্রদ্ধা। যৌবনের যাদুমন্ত্রে সে মধুসূদনকে বশ করিয়া লইবে, এমন দুরাশা তাহার অনেক দিন হইতেই ছিল। কিন্তু এতদিন মধুসূদনের মন মাঝে মাঝে টলিলেও হার মানে নাই। শ্যামাও মধুর মনের ঝোঁকটা ধরিতে পারিয়াছিল, কিন্তু কোনোদিন তাহার মনের ভয় ঘুচিতে-ছিল না। শ্যামাসুন্দরী মনে মনে মধুসূদনকে ভালবাসিয়াছিল। তাই মধুসূদনের বিবাহের পর হইতে সে আর থাকিতে পারিতেছিল না। মধু যদি কুমুকে অন্য সাধারণ মেয়েরই মত অবজ্ঞা করিত, তবেও বা সেটা একরকম সহ্য হইত। কিন্তু শ্যামা যখন দেখিল যে এতদিন যে-মধু তাহাকে অবহেলা করিয়া আসিয়াছে, সেই এখন কুমুদিনীর মন পাইবার জন্য তপস্যা করিতেছে; তখন আর সে সহ্য করিতে পারিল না। সে সাহস করিয়া আগাইয়া আসিয়া দেখিল মধুসূদন তাহাকে প্রশ্রয় দিতেছে।

কিন্তু যখন মধু শ্যামার কাছে থাকে তখনও তাহার মনের মধ্যে জাগে কুমুদিনীর কথা। কুমু মধুসূদনের আয়ত্তের অতীত, সেইখানেই তাহার অসীম জোর; আর শ্যামা তাহার এত বেশী আয়ত্তের মধ্যে যে তাহার ব্যবহার আছে, কিন্তু মূল্য নাই। তাই ঈর্ষার পীড়নে শ্যামার মনে মনে একটুও শান্তি নাই। সে মধুর পথ আগলাইয়া আগলাইয়া বেড়ায়, তাহার মনে সদাই আশঙ্কা কবে কুমু আপন সিংহাসনে ফিরিয়া আসে।

কুমুদিনী যেদিন প্রথম শ্যামাকে দেখিয়াছিল, সেইদিনই তাহার মনে হইয়াছিল শ্যামা আর মধু যেন একই মাটিতে গড়া একই কুমারের চাকে। যখন শ্যামার আর মধুর আচরণে আর কোনও অপ্রকাশ্যতা থাকিল না, তখন কুমুদিনী তাহার পীড়িত দাদার কাছে চলিয়া গিয়াছে, এবং সে খবর সেখানে তাহাদের কাছে গিয়াও পৌঁছিয়াছে।

শান্ত গম্ভীর বিপ্রদাস শ্যামার আর মধুর আচরণের সংবাদ পাইয়া ক্রোধে উগ্র হইয়া উঠিলেন। তিনি কুমুদিনীকে বলিলেন—'কুমু, অপমান সহ্য হ'য়ে যাওয়া শক্ত নয়, কিন্তু সহ্য করা অন্যায়। সমস্ত স্ত্রীলোকের হ'য়ে তোমার নিজের সম্মান তোমাকে দাবি করতে হবে, এতে সমাজে তোমাকে দুঃখ দিতে পারে দিক।' মোতির মা আর নবীন আসিল কুমুদিনীকে লইয়া যাইতে, সে না যাইলে যে তাহার স্বামী ঘরসংসার সব বেদখল হইয়া যাইতে বসিয়াছে!

বিপ্রদাস তাঁহার বোনকে ঐ অশুচি বাড়িতে পাঠাইতে অস্বীকার করিলেন। কুমুদিনীও যাইতে চাহিল না। বিপ্রদাস মোতির মাকেও বলিলেন—'স্ত্রী যদি সে অপমান মেনে নেয় তবে সকল স্ত্রীলোকের প্রতিই তাতে ক'রে অন্যায় করা হবে, এমনি ক'রে প্রত্যেকের দ্বারাই সকলের দুঃখ জমে উঠেছে।'

ইহার পর মধুসূদন নিজে আসিল কুমুকে লইয়া যাইতে। সে যে শ্যামাকে হুকুম করে, শাসন করে, প্রহার করে, কিন্তু তাহাকে তো একদিনও সম্মান করিতে পারে নাই। সে তাহাকে চাকর দিয়া নিজের শুইবার ঘরে ডাকিয়া পাঠাইতেও দ্বিধা করে নাই। কিন্তু সকল অবস্থার মধ্যেই মধুর মনে জাগিয়াছে কুমুদিনীর দৃপ্ত নারীত্বের অসামান্য মহিমা। তাই সে তাহার কাছে পরাভব স্বীকার করিয়া নিজে তাহাকে লইতে আসিল। কিন্তু কুমু কিছুতেই যাইতে সম্মত হইল না। তখন সে ক্রোধান্ধ হইয়া কুমুদিনীকে বলিল—'জানো, তোমাকে আমি পুলিশ দিয়ে ঘাড় ধরে নিয়ে যেতে পারি।' এখানেও তাহার সেই প্রভুত্বের ক্ষমতার দম্ভ।

কুমুদিনী স্বামীর কাছে যাইতে অস্বীকার করিয়াছে জানিয়া বিপ্রদাসের পুরাতন বিশ্বাসী কর্মচারী কালু বিষম ভীত হইয়া যখন বলিল—'সর্বনাশ!' তখন বিপ্রদাস বলিলেন—

'সর্বনাশকে আমরা কোনো কালে ভয় করিনে, ভয় করি অসম্মানকে।'

মধুসূদন মনে করিল নবীন আর মোতির মার কাছে প্রশ্রয় পাইয়াই কুমুদিনী তাহার বিরুদ্ধতা করিতে সাহস করিয়াছে। তাই সে তাহার ছোটভাই আর ভাইয়ের বৌকে তাড়াইবে। তাহারা আসিল কুমুদিনীর কাছ হইতে বিদায় লইতে। সেই সময় মোতির মা দেখিল যে কুমুদিনী গর্ভবতী। তাহারা বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

যখন কুমুদিনীর গর্ভ সম্বন্ধে আর সন্দেহ রহিল না, তখন বিপ্রদাস আর মধু দুজনেই শুনিলেন। বিপ্রদাস কুমুদিনীকে ডাকিয়া বলিলেন—'এখন তোর বন্ধন কাটাবে কে?' কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিল 'তবে কি আমাকে যেতে হবে দাদা?' বিপ্রদাস কুমুকে বলিলেন,—'তোকে নিষেধ কর্‌তে পারি এমন অধিকার আর আমার নেই। তোর সন্তানকে তার ঘর ছাড়া কর্‌ব কোন স্পর্দ্ধায়?'

কুমুদিনী বিনা আহ্বানে এবার নিজে যাচিয়া স্বামীর বাড়ি চলিয়া গেল। যাইবার সময় সে তাহার দাদাকে বলিয়া গেল —'কিন্তু একটা কথা তোমাকে ব'লে রাখি, কোনোদিন কোনো কারণেই তুমি ওদের বাড়ি যেতে পার্‌বে না। জানি দাদা তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌বে, কিন্তু ওদের ওখানে যেন তোমাকে না দেখ্‌তে হয়। সে আমি সইতে পারব না।'

কুমুদিনী আরও বলিল যেদিন সে সন্তান প্রসব করিয়া মুক্ত হইবে, সেদিন সে স্বাধীন হইয়া তাহার দাদার কাছেই চলিয়া আসিবে। কারণ মানুষের জীবনে এমন কিছু আছে যাহা ছেলের জন্য খোয়ান যায় না।

কুমুদিনীকে বিদায় দিয়া বিপ্রদাস নিতান্ত একাকী নিঃস্ব অসহায়। আর কুমু? কে জানে তাহার ইহার পরে কি ঘটিয়াছিল। লেখক এসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই।

এই উপন্যাসখানির মধ্যে তিনটি প্রধান, আর তিনটি অপ্রধান চরিত্র আঁকা হইয়াছে, আর কয়েকটি আছে আনুষঙ্গিক চরিত্র। সব কয়টিই জীবন্ত মানুষ হইয়াছে। তাহার মধ্যে সবচেয়ে ফুটিয়াছে মধুসূদন, বিপ্রদাস আর কুমুদিনী। নবীন, মোতির মা আর শ্যামাও অল্পের মধ্যে স্পষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে। আনুষঙ্গিক চরিত্রের মধ্যে আমাদের মনে ছাপ রাখে হাবলু বা মোতি, আর কালুদাদা।

মধুসূদনের চেহারা ও চরিত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিচয় পূর্বে দিয়াছি। কুমুদিনীরও পরিচয় আমরা পাইয়াছি। ইহাদের দুজনের চরিত্রের বৈপরীত্য লেখক অতি চমৎকার করিয়া দেখাইয়াছেন। প্রতিদিন যে হুকুম করিয়া লোককে অবিশ্বাস করিয়া অভ্যস্ত, সেই মধুসূদনের কাছে কুমুর সহজ অথচ অনমনীয় আত্মমর্যাদাবোধ অবোধ্য হইয়া যত বিভ্রাট সৃষ্টি করিয়াছে। বিপ্রদাস আর নবীন ঈশ্বরে অবিশ্বাসী অথচ

খাঁটি মানুষ। কুমুদিনী তাহার এই দাদার হাতে তৈয়ারী। বিদায়ের দিন সে তাহার দাদাকে বলিয়াছিল—'সমস্ত গিয়েও তবু বাকী থাকে, সেই আমার অফুরাণো—সেই আমার ঠাকুর। এ যদি না বুঝ্‌তুম তাহ'লে সেই গারদে ঢুক্‌তুম না। দাদা, এ সংসারে তুমি আমার আছ বলেই তবে একথা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি।' বিপ্রদাস ঠিক নাস্তিক ছিলেন একথা বলা যায় না। তাঁহার ধর্ম মনুষ্যত্বের ও ন্যায়নিষ্ঠার, আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই উপন্যাসে হঠাৎ-ধনী আর বনিয়াদী অভিজাত ব্যক্তির চরিত্রের তারতম্য অতি সুন্দর করিয়া দেখান হইয়াছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে গত ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার ধনীগৃহের ছবি অত্যন্ত সুন্দরভাবে আঁকা হইয়াছে।

সমাজে স্ত্রীলোকের অধিকার, গৃহে তাহার স্থান আর মর্যাদা, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, প্রভৃতি বহু সমস্যার সমাধান এই উপন্যাসখানির মধ্যে পাওয়া যায়। একদিকে জোর করিয়া শ্রদ্ধা প্রীতি আদায় করিবার চেষ্টা, আর তাহার পাশেই অনায়াসে উৎসারিত শ্রদ্ধাভক্তির চিত্র চমৎকার হইয়াছে।

বিপ্রদাস যেন গ্রন্থকারের প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'গোরা'র পরেশবাবুরই প্রতিচ্ছবি। শান্ত সমাহিত, অথচ দৃঢ় বলিষ্ঠ প্রকৃতি। তাঁহাকে জানিলেই শ্রদ্ধা করিতে হয়, তাঁহার কাছে মাথা আপনি নত হয়।

এই উপন্যাসের মূল কথাটি হইতেছে যে লোকের হার-জিৎ

বাহির হইতে দেখা যায় না, তাহার ক্ষেত্রটা লোকচক্ষুর অগোচরে। জগতে যাঁহারা 'মার্টার', যাঁহারা বাস্তবিক বড়লোক, তাঁহারা কালে কালে অযোগ্যের হাতে মার খাইয়াই নিজেদের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। যাহারা সামান্য সাময়িক পশুশক্তিতে বলবান তাহারা ভিতরে ভিতরে যাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে, বাহিরে তাহাকেই মারে। এইজন্য মধুসূদনের হাতে কুমুদিনীর লাঞ্ছনা, আর বিপ্রদাসের অপমান।

এই বইখানিকে অসমাপ্ত বলিতে হইবে। কুমুদিনী স্বামীর বাড়ি ফিরিয়া যাইবার পর তাহার অভ্যর্থনা সেখানে কিরকম হইয়াছিল, তাহার সন্তান হইবার পর সে কি করিয়াছিল, আর সুবোধ—বিপ্রদাসের ছোট ভাই, কুমুদিনীর ছোট দাদা বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলেই বা তাহাদের পরিবারে কি ঘটিল, এই সব খবর লেখক আমাদের দেন নাই। তাহা ছাড়া বইখানির আরম্ভ হইয়াছে কুমুদিনীর পুত্র অবিনাশ ঘোষালের জন্মদিন উপলক্ষ্য করিয়া। তখন তাহার বয়স হইয়াছে বত্রিশ। এই বত্রিশ বৎসরের ছেলে অবিনাশ পিতামাতার মাঝখানে থাকিয়া তাহাদের জটপাকানো জীবনের জট কতখানি খুলিয়াছে বা আরও পাকাইয়া তুলিয়াছে তাহারও খবর আমরা কিছু জানিতে পারি নাই। আরম্ভেরও পূর্বে যে আরম্ভ আছে তাহার কথাতেই এই বই সমাপ্ত হইয়াছে, আসল গল্পের উপসংহার বাকী থাকিয়া গিয়াছে। অবিনাশের বত্রিশ বৎসরের

ইতিহাস ব্যক্ত হয় নাই। সেই অপ্রকাশিত ইতিহাস জানিবার জন্য মনের মধ্যে একটা আগ্রহ থাকিয়া যায়, আর বইখানিকে অসমাপ্ত মনে হয়।

এই উপন্যাসের বিষয় হইতেছে দাম্পত্য সম্পর্কের সমস্যা। সেই জন্য ইহার মধ্যে নরনারীর সম্পর্কের আর অধিকারের অনেক ব্যাপার উপস্থিত করা হইয়াছে, এবং সেগুলির নিপুণ বিশ্লেষণ ও সমাধান করা হইয়াছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথই আমাদের বাঙলা উপন্যাসে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ প্রথম প্রবর্তন করেন, এবং এই কর্মে তাঁহার অনন্যসাধারণ দক্ষতা সর্বজন-বিদিত।

নরনারীর আকর্ষণ বিকর্ষণের তত্ত্ব সমাধানের জন্য এই উপন্যাসে শ্যামাসুন্দরীকে অবতারণ করিতে হইয়াছে। সে যেন কুমুদিনীর চরিত্রের পটভূমিকা হইয়া কুমুর চরিত্র আর শুচিতা আরও ফুটাইয়া তুলিয়াছে, এবং মধুসূদনেরও চরিত্রকে স্পষ্টতর করিয়াছে। কিন্তু শ্যামার আচরণ এমন লালসাময় এবং কুশ্রী যে তাহার কথা পড়িতে গেলে মনে জুগুপ্‌সা উদিত হয়। এইটি অপরিহার্য অঙ্গ হইলেও মনে হয় এই দৃশ্যটা না থাকিলেই ভাল হইত।

উপন্যাসের আগাগোড়াই ঘাত-প্রতিঘাত আর সংঘাত, কাজেই মন ক্লান্ত হইয়া যাইবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু লেখকের স্বভাবসিদ্ধ স্বচ্ছ অনাবিল হাস্যরস প্রায় সকল কথোপকথনের ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকিয়া উপন্যাসের কঠোরতাকে সরস করিয়াছে।

স্বার্থ মান অভিমান মর্যাদা সম্মান বৈষয়িকতা অ-বনিবনা আর ভুল বোঝা-বুঝির মধ্যে বালক হাব্‌লু বা মোতির সরল একাগ্র প্রীতি আর ভালবাসা সমস্ত বইখানিকে বিশুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সর্বোপরি বিরাজ করিতেছে বিপ্রদাসের বলিষ্ঠ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। বিপ্রদাসের চরিত্র যেন মধুসূদনের সকল কলুষতা আর ক্ষুদ্রতা ডুবাইয়া দিয়া সমস্ত পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া বিশুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

শেষের কবিতা

শেষের কবিতা রবীন্দ্রনাথের উপান্ত উপন্যাস। এই উপন্যাসখানি নিছক উপন্যাস নহে। এইটি কবিবরের শেষের কবিতাও বটে; এইটি গদ্যপদ্যময় চম্পূ কাব্য। ইহার গদ্যও কবিতার সহধর্মী, এবং ইহার মধ্যে অনেকগুলি কবিতা প্রসঙ্গক্রমে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এই হিসাবে এই উপন্যাসখানি একটু নূতন ধরণের। ইহার পূর্বে বাঙ্‌লাতে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'ভানুমতী উপন্যাস' এইরূপ গদ্যপদ্যসমন্বিত আকারে প্রকশিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া আর কোন উপন্যাস এই ধরণের আছে কি না তাহা আমার জানা নাই।

উপাখ্যানের পাত্র-পাত্রীগুলি বিলাতী ভাবাপন্ন ধনী বাঙালী সমাজের এক একটি টাইপ, মূর্তিমান অবতার। বই পড়িতে পড়িতে মনে হয়, তাহারা যেন আমাদের চোখে দেখা চেনা লোক, যেমন ইহার আগে 'গোরা' উপন্যাসে পানুবাবু বরদাসুন্দরী লাবণ্য ললিতা সুচরিতা আমাদের চেনাশোনা লোকেদেরই ছবি বলিয়া মনে হইয়াছিল। ইহারা সবই সজীব, সংসারের মানুষ।

নায়ক হইতেছে অমিত রায়, কিন্তু তাহাদের সমাজের বিলাতী কায়দায় আর অনুকরণের উচ্চারণে সে হইয়া দাঁড়াইয়াছে 'অমিট্রায়ে'। সে ধনী ব্যারিষ্টারের ছেলে, নিজে

ব্যারিষ্টার। সে মানব জীবনে স্টাইলের ভক্ত, কাজেই নিজেও বেশ স্টাইলিস্ট্, বাক্যবাগীশ, কথার তুব্ড়ী। তাহার তুই বোন সিসি আর লুসি তাহারাও মূর্তিমতী ফ্যাশান। অমিতের কথায় লোকের চমক লাগে, তাহাতে বুদ্ধির প্রাচুর্য এত বেশী যে মনে ধাঁধাঁ লাগাইয়া দেয়। সে কবিত্বে আর দার্শনিকত্বে মিলাইয়া যে খিচুড়ি বানায় তাহা যেমন মুখরোচক তেমনি গুরুপাক। সে বহু মেয়ের সঙ্গে একটু বেশী ঘনিষ্ঠ রকমেই মিশে, ভাল লাগার আভাস দেয়, কিন্তু কাহাকেও সে ভাল-বাসিতে পারে না। সেকথা লিলি গাঙ্গুলী একদিন তাহার মুখের উপর স্পষ্টই শুনাইয়া দিয়াছিল, যখন সে লিলিকে একটু বিশেষ পক্ষপাত দেখাইতে উদ্যত হইয়াছিল। সে রবি-ঠাকুরের লেখার বিরোধী, কারণ রবি-ঠাকুর অনেকদিন বাঁচিয়া অন্য কবিদের পথরোধ করিয়া রাখিয়াছেন। সকল সভা-সমিতিতে কেবল নিছক রবি-ঠাকুরের কবিতা আর বইয়ের আলোচনা হয়, ইহাতে সে আপত্তি উত্থাপন করে। সে তাঁহাকে লেখা থামাইয়া দিয়া অপরকে আসর অধিকার করিবার সুযোগ করিয়া দিতে বলে, আর মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করে নিবারণ চক্রবর্তী নামক এক অজ্ঞাত অখ্যাত কবিকে অর্থাৎ নিজেরই বেনামদারকে। নিবারণ চক্রবর্তী যে সে নিজে তাহার পরিচয় ধরা পড়িয়া গিয়াছে, সে স্বীকার কবুল করিয়াছে যে 'ঐ লোকটা আমার মনের কথার ভাণ্ডারী।' আর তাহার জীবনের গিল্‌টি যাহার কাছে সম্পূর্ণ ধরা পড়িয়া

খসিয়া মুছিয়া গিয়াছিল, সেই তাহার 'বন্যা' বলিয়াছে—'তুমি কি ভাব্চ প্রথম দিন থেকেই আমি জান্তে পারি নি যে তুমিই নিবারণ চক্রবর্তী?' অমিত কিন্তু অসামান্য,—কথায় বার্তায়, বেশে ভূষায়, চাল-চলনে, মতে-ধারণায়। সাধারণের মত ধারণা ও আচরণের বিপরীত কিছু করাতেই তাহার মৌলিকত্বের আনন্দ। কেবল যাহাকে সে নিন্দা করে সেই রবি-ঠাকুরেরই কবিতার মতন তাহার কবিতা, সেই সাদৃশ্য থাকাতেই সে বোধ হয় তাহা লুকাইবার জন্য অত কোমর বাঁধিয়া নিন্দা করে।

অমিত গিয়াছে শিলঙ্ পাহাড়ে বেড়াইতে। মোটর-ধাক্কা লাগিল লাবণ্যলতার মোটরের সঙ্গে। 'গোরা' উপন্যাসে যেমন গাড়ীর অপঘাতে বিনয়ের সঙ্গে পরেশ বাবু আর সুচরিতার পরিচয় হইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল, এখানেও তেমনি মোটর-সংঘাতে অমিতর সঙ্গে ঘটিল পরিচয় লাবণ্যলতার, যে শীঘ্রই অমিতর কাছে হইয়া উঠিল 'বন্যা', আর অমিতও তাহার কাছে হইয়া গেল 'মিতা'। মোটর সংঘাতে দুজনেই জখম হইল,—দেহে নহে; মনে, মনোভাবের আবির্ভাবে। যে অমিত এতদিন প্রণয় লইয়া কেবল ভাববিলাসিতা করিয়াছে, সেই এখন প্রণয়কে জীবনের জীবনরূপে অনুভব করিল। আর লাবণ্যলতাও স্বীকার করিল 'এক সময়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমি নিতান্তই শুক্নো,—কেবল বই পড়্ব আর পাশ কর্ব, এমনি করেই আমার জীবন কাট্বে। আজ হঠাৎ দেখ্লাম, আমিও

ভালবাস্‌তে পারি।...মনে হয় এত দিন ছায়া ছিলুম, এখন সত্য হয়েছি।'

লাবণ্যর একটু পুরাবৃত্ত আছে। সে ধনী অধ্যাপকের একমাত্র কন্যা। তাহার বাবা তাহাকে এমন করিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন যাহাতে মনের আর সকল দরজার দিকে তাহার নজর দিবার অবসর হয় নাই। সেই অধ্যাপকেরই ছাত্র ছিল শোভনলাল। বেচারা মুগ্ধকণ্ঠিত পূজারীর মত সকলের অগোচরে লাবণ্যকে ভালবাসিত, আর যেমন করিয়া একলব্য একান্ত মনে দ্রোণাচার্যের মূর্তিকে গুরুর আসনে বসাইয়া সাধনা করিয়াছিল, তেমনি শোভনলাল লাবণ্যর একখানি ছবি আঁকাইয়া তাহাকেই ফুল দিয়া ঢাকিয়া নিজের গোপন হৃদয়ের প্রণয় নিবেদন করিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার সেই গোপন পূজা ধরা পড়িয়া গেল, আর লাবণ্য তাহাকে কঠোর তিরস্কার করিয়া তাহাদের বাড়ী হইতে দূর করিরা দিল। শোভনলাল একটি কথাও না বলিয়া অপরাধীর মত মাথা নত করিয়া চলিয়া গেল। বিপত্নীক অধ্যাপক এতদিন কন্যার প্রণয় ও পরিণয় অনাবশ্যক মনে করিয়া তাহাকে গঠন করিয়া আসিয়াছেন, এখন নিজেই এক বিধবার প্রণয়ে পড়িয়া তাহাকে পরিণয়ে নিজের করিবার জন্য একটু উৎসুক হইলেন। অথচ কন্যার বিবাহ না হইলে ত তিনি পুনরায় বিবাহ করিতে পারেন না। লাবণ্য বাবার মনের ভাব টের পাইল এবং নিজে উদ্‌যোগী হইয়া পিতার বিবাহ দিল, আর তারপর পিতার সকল সম্পত্তি ও

সম্পর্ক ছাড়িয়া দিয়া সে নিজে উপার্জন করিতে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সে হইল বিধবা যোগমায়ার কন্যা সুরমার শিক্ষয়িত্রী। যোগমায়ারও একটি ছোট পুরাবৃত্ত আছে। কিন্তু সেটুকু না জানিলেও আমাদের বইখানির উপাখ্যান বুঝিতে বেশী অসুবিধা হইবে না। অমিত লাবণ্যর বাসায় গিয়া যোগমায়ার সঙ্গেও পরিচিত হইল, আর সহজেই তাঁহার সঙ্গে মাসি বোনপো সম্বন্ধ পাতাইয়া তাঁহার স্নেহভাজন হইয়া উঠিল। সে যখন তাঁহার কাছে লবণ্যের পাণিপ্রার্থী হইয়া তাঁহার অনুমতি ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করিল, তখন যোগমায়া তাহাকে বলিলেন—'ধরেই নাও লাবণ্যকে তুমি পেয়েচ। তার পরেও হাতে পেয়েও যদি তোমার পাবার ইচ্ছা প্রবল থেকেই যায় তবেই বুঝবো লাবণ্যের মত মেয়েকে বিয়ে কর্‌বার তুমি যোগ্য।' অমিত বলিল—'ভয় নেই আপনার। পেয়ে পাওয়া ফুরোয় না, বরঞ্চ চাওয়া বেড়েই ওঠে, লাবণ্যকে বিয়ে করে এই তত্ত্ব প্রমাণ কর্‌বে ব'লেই অমিত রায় মর্তে অবতীর্ণ।'

যোগমায়ার মনে যে ভয় জাগিয়াছিল অমিতের স্বভাব দেখিয়া, লাবণ্য তাহা জানিয়াও ভয় পায় নাই। সে বলিয়াছিল—'মিতা তোমার রুচি, তোমার বুদ্ধি আমার অনেক উপরে। তোমার সঙ্গে একত্রে পথ চল্‌তে গিয়ে একদিন তোমার থেকে বহুদূরে পিছিয়ে পড়্‌ব, তখন আর তুমি আমাকে ফিরে ডাক্‌বে না। সেদিন আমি তোমাকে একটুও দোষ দেবো না।...' লাবণ্যকে অমিতের ভাল লাগিতেছে সে

তাহার বুদ্ধির আর চিন্তার যেন শাণযন্ত্র হইয়াছে বলিয়া। তাহার বুদ্ধিতে শাণ লাগাইবার জন্যই লাবণ্যকে তাহার প্রয়োজন, আর কিছুর জন্য নয়; ঘরসংসার পাতিয়া বন্দী হইবার মানুষ অমিত নহে। একথা লাবণ্য বুঝিতে পারিয়া অমিতকে বলিয়াছিল—'আচ্ছা মিতা, তুমি কি মনে করো না, যেদিন তাজমহল তৈরী শেষ হল, সেদিন মম্‌তাজের মৃত্যুর জন্যে সাজাহান খুশী হয়েছিলেন? তাঁর স্বপ্নকে অমর কর্‌বার জন্যে এই মৃত্যুর দরকার ছিল। এই মৃত্যুই মম্‌তাজের সব চেয়ে বড় প্রেমের দান। তাজমহলে শাজাহানের শোক প্রকাশ পায় নি, তাঁর আনন্দ রূপ ধরেছে।'

লাবণ্য জানে যে অমিত চিরপলাতক। তাই লাবণ্য স্থির করিল তাহারা চাহিবে না বিবাহের বন্ধন। চাহিবে প্রেমের মুক্তি; ইহাদের প্রেম সুখের দাবী করিবে না, প্রিয়ের ইচ্ছাকে মুক্ত রাখিয়া দিতে পারার আনন্দ চাহিবে।

বিবাহের বন্ধনে স্বত্ব-স্বামিত্ব-বোধের স্থূলভতায় তাহারা পরস্পরের কাছে অতি-পরিচয়ে তুচ্ছ খেলো হইয়া যাইতে পারে এ ভয় অমিতর মনেও ছিল। এই জন্য বিবাহের রাত্রে জীবনে যে বাঁশী বাজে, সংসারে প্রবেশ করিলে সে সুর আর শুনিতে পাওয়া যায় না। তাই মনে প্রশ্ন উঠে—"বিয়ের এই প্রথম দিনের সুরের সঙ্গে প্রতিদিনের সুরের মিল কোথায়? গোপন অতৃপ্তি, গভীর নৈরাশ্য; অবহেলা অপমান অবসাদ; তুচ্ছ কামনার কার্পণ্য, কুশ্রী নীরসতার কলহ, ক্ষমাহীন ক্ষুদ্রতার

সংঘাত, অভ্যস্ত জীবনযাত্রার ধূলিলিপ্ত দারিদ্র্য,—বাঁশির দৈববাণীতে এই সব বার্তার আভাস কোথায় ?—(রবীন্দ্রনাথ, বাঁশি।) যদিও সে লাবণ্যকে বিবাহে সম্মত করিবার জন্য অনুনয়-বিনয় করিয়াছিল, তবু তাহার ভবিষ্যৎ সংসারের যে-চিত্র আঁকিয়া সে লাবণ্যকে মুগ্ধ করিতে চাহিতেছে তাহাতে তাহার ব্যবস্থা হইবে চখাচখির মত। একটা বাগানবাড়ির মধ্যে কাটা খালের এপারে ওপারে দুটি বাড়িতে হইবে দুজনার বাস। কেহ কাহারও কাছে বিনা এত্তালায় হঠাৎ অপ্রস্তুত অবস্থায় উপস্থিত হইবে না। তাই অমিত লাবণ্যকে বলিতেছে—'ইচ্ছাকৃত বাধা দিয়েই কবি ছন্দের সৃষ্টি করে। মিলনকেও সুন্দর করতে হয় ইচ্ছাকৃত বাধায়। চাইলেই পাওয়া যায় দামী জিনিসকে এত সস্তা করা নিজেকেই ঠকানো। কেন-না, শক্ত ক'রে দাম দেওয়ার আনন্দটা বড় কম নয়।' তাহাদের সাক্ষাৎ হইবে তাহাদের শ্রেষ্ঠ আর্টিষ্টিক মনভুলানো অবস্থায়। নতুবা হঠাৎ কাহারও ত্রুটি হঠাৎ চোখে পড়িলে মনের আর্টিস্টিক অনুভবে আঘাত লাগিতে পারে, আর তাহাতে মন বিগড়াইয়া যাইতে পারে। এই আশঙ্কা করিয়াই বহু বহু শতাব্দী আগে মনু বিধান দিয়া গিয়াছিলেন যে—'ভার্যার সহিত একত্রে ভোজন করিবে না, ভোজন করিতেছে এমন সময় ভার্যাকে অবলোকন করিবে না। হাঁচিতেছে, হাই তুলিতেছে বা যথা-সুখে অসংযতভাবে বসিয়া আছে—এমন সময়েও ভার্যাকে দেখিবে না। নেত্রদ্বয়ে কজ্জল প্রদান করিতেছে, অনাবৃত

হইয়া তৈলম্রক্ষণ করিতেছে,…এমন সময়েও ভার্যাকে অবলোকন করিবে না”—(চতুর্থ অধ্যায়)। এই আশঙ্কাতেই ভিক্তর হুগো তাঁহার প্রণয়িনীকে নিজের আবাসস্থল হইতে চারি মাইল দূরে রাখিয়া দিয়াছিলেন। উভয়ের বহু দিনের বিচ্ছেদের পর মাঝে মাঝে কাহারও আহ্বানে কেহ নির্দিষ্ট সময়ে অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, পাছে কেহ অপরের অপ্রস্তুত অবস্থায় উপস্থিত হইয়া সৌন্দর্য-পিপাসু মনকে বিরক্ত করিয়া তোলেন এই আশঙ্কায়। এই আশঙ্কা করিয়াই থিয়োফিল গতিয়ের মানস-সৃষ্টি মাদ্‌মোয়াজেল মোপ্যাঁ যে প্রিয়তম তাহাকে পাইবার জন্য বশ্বব্রিহ্মাণ্ড খুঁজিয়া বেড়াইয়া তবে সন্ধান পাইয়াছে তাহাকে কেবল মাত্র একটি রাত্রে দেখা দিয়া চিরদিনের জন্য পালাইয়া গিয়াছিল, পাছে সে অতি-পরিচয়ে পুরাতন অবহেলিত হইয়া যায়।

এই রকম যখন কবিত্বময় কল্পনায় অমিত তাহার বন্যাকে নিজের জীবনের সঙ্গে জড়াইয়া লইবার নেশায় মশ্‌গুল হইয়া আছে, আর অল্পদিন পরেই তাহাদের বিবাহ হইবে স্থির হইয়াছে, এমন সময় আসিল লাবণ্যলতার কাছে তাহার বহুদিন আগে বিতাড়িত অপমানিত অনুরক্ত ভক্ত শোভনলালের একটি কুণ্ঠিত প্রশ্ন—‘তোমার কাছে শাস্তি পেয়েছি, কিন্তু কবে কি অপরাধ করেছি আজ পর্যন্ত স্পষ্ট ক’রে বুঝ্‌তে পারি নি। আজ এসেছি তোমার কাছে সেই কথাটি শোন্‌বার জন্যে, নইলে মনে শান্তি পাইনে। ভয় করো না। আমার আর কোনো প্রার্থনা নেই।’

এই অল্পদিন আগেই লাবণ্যকে অমিত বলিয়াছিল—'হঠাৎ শোভনলালের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি। তার নাম শুনেছ বোধ হয়, রামচাঁদ প্রেমচাঁদওয়ালা। এক সময় সে ক্ষেপেছিল আফ্‌গানিস্থানের প্রাচীন শহর কাপিশের ভিতর দিয়ে একদিন যে পুরোনো রাস্তা চলেছিল সেইটেকে আয়ত্ত কর্‌বে। তারপর থেকে দুর্গম হিমালয়ের মধ্যে কেবলই পথ খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কখন কাশ্মীরে, কখন কুমায়ুনে।—প্রথম যৌবনে একদিন শোভনলাল কোন্ কাঁকণপরা হাতের ধাক্কা খেয়েছিল, তাই ঘরের থেকে পথের মধ্যে ছিট্‌কিয়ে পড়েছে। ওর সমস্ত কাহিনীটা স্পষ্ট জানিনে, কিন্তু···বুঝ্‌তে পার্‌লুম ওর জীবনের কোনখানে অত্যন্ত নিষ্ঠুর কথা বিঁধে আছে। সেই কথাটাকেই বুঝি পথ চল্‌তে চল্‌তে ও ক্ষইয়ে দিতে চায়।'

লাবণ্য এখন অমিতকে ভালবাসে, আর অমিতর সরব আর সাহসী ভালবাসার পরিচয় পাইয়া ভীরু শোভনলালের ভালবাসার মর্যাদা আর ব্যথার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল। 'যে অঙ্কুরটা বড় হ'য়ে উঠ্‌তে পার্‌ত অথচ যেটাকে চেপে দিয়েছে, বাড়্‌তে দেয়নি, তার সেই কচি বেলাকার করুণ ভীরুতা ওর মনে এল। এতদিনে সে ওর সমস্ত জীবনকে অধিকার ক'রে তাকে সফল কর্‌তে পার্‌ত। কিন্তু সেদিন ওর ছিল জ্ঞানের গর্ব; বিদ্যার একনিষ্ঠ সাধনা, উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যবোধ। সেদিন আপন বাপের মুগ্ধতা দেখে ভালবাসাকে

দুর্বলতা ব'লে মনে মনে ধিক্কার দিয়েছে। ভালবাসা আজ তার শোধ নিলো, অভিমান হল ধূলিসাৎ। সেদিনকার জীবনের সেই অতিথিকে দুহাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে আজ বাধা পড়ে, তাকে ত্যাগ করতেও বুক ফেটে যায়। মনে পড়্ল অপমানিত শোভনলালের সেই কুণ্ঠিত মূর্তি। তার পরে কতদিন গেছে, যুবকের সেই প্রত্যাখ্যাত ভালবাসা এতদিন কোন অমৃতে বেঁচে রইল? আপনারই আন্তরিক মাহাত্ম্যে।'

যখন লাবণ্যের মনের এই অবস্থা, তখন অমিতর অজ্ঞাত-বাস ও অজ্ঞাতবাসের কারণ আবিষ্কার করিবার জন্য তাহার বোন সিসি আসিল শিলং পাহাড়ে। কাজে কাজেই তাহার সঙ্গে আসিল তাহার অনুরক্ত নরেন মিটার আর নরেনের বোন ও সিসির সখী কেটি মিটার। কেটি মিটারের এই অভিমানের মধ্যে একটু স্বার্থের আমেজ ছিল। যখন সে আর অমিত বিলাতে ছিল তখন একদিন অমিত তাহার হাতে একটি আঙ্‌টি পরাইয়া দিয়াছিল। সে আজ সাত বৎসরের আগেকার কথা। কেটি কিন্তু সেই দিনটিকে আর অমিতকে কিছুতেই ভোলেনি। সে অমিতর চঞ্চল মনকে চিরবন্দী করিতে পারে নাই, তাই সে ইহার মধ্যে আর কাহারও মনোরঞ্জন করা যায় কি না তাহা দেখিবার জন্য তাহাদের সমাজের উপযুক্ত মেমের নকল হইয়া উঠিবার জন্য সাধনা করিয়াছে, তাহার চালচলন এখন 'বিলিতি কৌলিন্যের ঝাঁঝালো

এসেন্‌স', তাহার কেশ বেশ সবই এখন 'অনুকরণের উল্লম্ফনশীল পরিণত অবস্থা প্রতিপন্ন কর্‌ছে। মুখের স্বাভাবিক গৌরিমা বর্ণপ্রলেপের দ্বারা এনামেল-করা। তারা তিন জনে মিলিয়া আবিষ্কার কর্‌লে অমিতর অজ্ঞাতবাসের কারণ, আর অভিমান ক'রে ক'সে অপমান ক'রে দিলে লাবণ্যকে আর সেই সঙ্গে যোগমায়াকেও। নিজের অজস্র কঠোরতায় কেটির একটা গর্ব আছে।'

এমন সময় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল অমিত। সে উহাদের ব্যবহার দেখিয়া বিদ্রোহ করিয়াই লাবণ্যর হাতে আঙ্‌টি পরাইয়া দিল এবং কেটিকে উপেক্ষা করিয়াই নিজের বোনকে সম্বোধন করিয়া বলিল 'সিসি, এঁরই নাম লাবণ্য।........এর সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হ'য়ে গেছে, কল্‌কাতায় অঘ্রাণ মাসে।'

কেটি মুখে হাসি টানিয়া যদিও প্রথমটায় বলিল, 'আই কন্‌গ্র্যাচুলেট্‌!' কিন্তু অবশেষে তাহাকে বলিতে হইল—স্বীকার করিতেই হইল যে, 'এই আঙ্‌টি একদিন তুমিই দিয়েছিলে। এক মুহূর্ত হাত থেকে খুলিনি, এ আমার দেহের সঙ্গে এক হ'য়ে গেছে। শেষকালে আজ এই শিলঙ্‌ পাহাড়ে কি এ'কে বাজিতে খোয়াতে হবে!···মনে মনে নিজের উপর অহঙ্কার ছিল, আর মানুষের উপর ছিল বিশ্বাস। অহঙ্কার ভাঙ্‌ল ···আমারি হার।···বাজিতে যদিই হার্‌লুম, তবে আমার এই চিরদিনের হারের চিহ্ন তোমার কাছেই থাক্‌ অমিট।

আমার হাতে রেখে এ'কে আমি মিথ্যে কথা বল্‌তে দেবো না।'

'কেটি আংটি খুলে রেখেই দ্রুতবেগে চলে গেল। এনামেল করা মুখের উপর দিয়ে দরদর ধারে চোখের জল গড়িয়ে পড়্‌তে লাগল।' গভর্ণেস্‌ লাবণ্যর হাত হইতে অভিজাত অমিটকে উদ্ধার করার আশা তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইল।

লাবণ্য নিজের হৃদয়ের প্রেমের বেদনা দিয়া কেটির বেদনা বুঝিতে পারিল। লাবণ্য আস্তে আস্তে অমিতকে বলিল, 'একদিন একজনকে যে আঙ্‌টি পরিয়েছিলে, আমাকে দিয়ে আজ সে আঙ্‌টি খোলালে কেন ?'

অমিত বলিল, 'সেদিন যাকে আঙ্‌টি পরিয়েছিলুম, আর যে আজ সেটা খুলে দিলে, তারা দুজনে কি একই মানুষ ?'

লাবণ্য বলিল, 'তাদের মধ্যে একজন সৃষ্টিকর্তার আদরে তৈরী, আর একজন তোমার অনাদরে গড়া।....মিতা, একদিন যে নিজেকে সম্পূর্ণ তোমার হাতে উৎসর্গ করেছিল, তাকে তুমি আপনার ক'রে রাখ্‌লে না কেন ? যে কারণেই হোক আগে তোমার মুঠো আল্‌গা হয়েছে, তার পরে দশের মুঠোর চাপ পড়েছে ওর উপরে, ওর মূর্তি গেছে বদ্‌লে। তোমার মন একদিন হারিয়েছে ব'লেই দশের মনের মত ক'রে নিজেকে সাজাতে বস্‌ল।....তোমার সঙ্গে আমার যে অন্তরের সম্বন্ধ তা নিয়ে তোমার লেশমাত্র দায় নেই।

আমি রাগ ক'রে বল্‌ছি না, আমার সমস্ত ভালবাসা দিয়েই বল্‌ছি, আমাকে তুমি আঙ্‌টি দিয়ো না, কোন চিহ্ন রাখ্‌বার কোন দরকার নেই। আমার প্রেম থাক নিরঞ্জন, বাইরের রেখা, বাইরের ছায়া তাতে পড়্‌বে না।'

'এই ব'লে সে নিজের আঙুল থেকে আঙ্‌টি খুলে অমিতর আঙুলে পরিয়ে দিলে, অমিত কোন বাধা দিলে না।'

অমিত আর লাবণ্য ছুজনেই তাহাদের পরস্পরের ভালবাসার আলোকে অপরের ভালবাসার মর্ম সহজে বুঝিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল। তাই অমিত কেটির ভালবাসার মান রক্ষা করিতে আর লাবণ্য শোভনলালের ভালবাসার মান রক্ষা করিতে সঙ্কল্প স্থির করিল। কেটি মিটার অমিতর ভালবাসা ফিরিয়া পাইয়া আবার হইল কেতকী মিত্র। তারপর লাবণ্যর সঙ্গে শোভনলালের, আর কেতকীর সঙ্গে অমিতর বিবাহ হইবে সবাই জানিল। কিন্তু লাবণ্যর আর অমিতের ভালবাসার হ্রাস হইল না, তাহারা তাহাদের প্রণয় দিয়াই তাহাদের পুরাতন প্রণয় খুঁজিয়া ফিরিয়া পাইয়াছে।

অমিত আর লাবণ্য যে কেমন করিয়া একসঙ্গে ছুজনকে ভালবাসিতে পারে তাহা লইয়া যোগমায়ার ছেলে মতির মনে সন্দেহ উদয় হইলে অমিত তাহাকে বলিয়াছিল—'অক্‌সিজেন একভাবে বয় হাওয়ায় অদৃশ্য থেকে, সে না হ'লে প্রাণ বাঁচে না। আবার অক্‌সিজেন আর একভাবে কয়লার সঙ্গে যোগে জ্বাল্‌তে থাকে, সেই আগুন জীবনের নানা কাজে দরকার,—

দুটোর কোনোটাকেই বাদ দেওয়া চলে না।....যে ভালবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে, অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ; যে ভালবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের সব কিছুতে মুক্ত হ'য়ে থাকে, সংসারে সে দেয় আসঙ্গ। দুটোই আমি চাই।··· একদিন আমার সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ, আজ আমি পেয়েছি আমার ছোট্টো বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেছি। কিন্তু আমার আকাশও রইল। কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল, প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাবণ্যর সঙ্গে আমার যে ভালবাসা সে হ'ল দীঘি, সে ঘরে আন্‌বার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।······কেতকী সম্পূর্ণ বোঝেন কিনা বল্‌তে পারি নে। কিন্তু সমস্ত জীবন দিয়ে এইটেই তাঁকে বোঝাবো যে, তাঁকে কোথাও ফাঁকি দিচ্ছি নে। এও তাঁকে বুঝ্‌তে হবে যে লাবণ্যর কাছে তিনি ধন্য।'

উপন্যাসের উপাখ্যান অত্যল্প। কিন্তু ইহার মধ্যে নর-নারীর হৃদয়ের একটি গভীর সমস্যা উপস্থিত করা হইয়াছে এবং আমাদের মনে হয়, তাহার মীমাংসাও করা হইয়াছে এই বইয়ের ভাষার প্রশংসা অনেকে মুক্তকণ্ঠে করিয়াছেন। বাস্তবিক এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির খেলা কোন উপন্যাসের পাত্র পাত্রীর কথাবার্তায় আর দেখা যায় নাই। কথায় কথায় রূপক আর উপমা, খুঁটিনাটি বর্ণনার কারিগরী আর বাহাদুরী সমস্ত হৃদয় মন দিয়া উপভোগ করিবার জিনিস হইয়াছে। সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব আর

মানসিক দ্বন্দ্ব, প্রেমতত্ত্বের একটা রহস্য ও তাহার মীমাংসা, একটি বিশেষ সমাজের নরনারীর চরিত্র-চিত্রণ, যুবক-যুবতীদের হাব-ভাব বেশ-ভূষা সম্বন্ধে নিপুণ ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, কথায় কথায় হাস্যরসের আভাস পাঠক-পাঠিকাকে অভিভূত, আশ্চর্য ও মুগ্ধ করিয়া তুলে। অমিতর কথা শুনিয়া লাবণ্য হাসিতেছে দেখিয়া অমিত বলিয়াছিল—'হাস্‌ছেন! আমার গভীর কথাতেও গাম্ভীর্য রাখ্‌তে পারিনে। ওটা মুদ্রাদোষ। আমার জন্মলগ্নে আছে চাঁদ। ঐ গ্রহটি কৃষ্ণাচতুর্দশীর সর্বনাশা রাত্রেও একটুখানি মুচ্‌কে না হেসে মর্‌তেও জানে না।' যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের কোষ্ঠীর খবর রাখেন তাঁহারা জানেন যে তাঁহার জন্মলগ্নে আছে চাঁদ, আর অমিতর বেনামী কথাটা তাঁহারই নিজের কথা,—তাঁহার বেলায় সেটি খুব খাটে। নিবারণ চক্রবর্তীর বেনামী স্বয়ং রবি-ঠাকুরই যে সব কবিতা লিখিয়াছেন সেগুলিও তাঁহার আগের কবিতার হইতে আলাদা ধরণের,—বড় গভীর অর্থভরা। এইজন্যই এই বইয়ের নাম রাখা হইয়াছে শেষের কবিতা।

পঞ্চভূত

রবীন্দ্রনাথ পঞ্চভূতের জবানী রহস্যময় জীবনের গতি ও চিন্তাজগতের পরস্পর বিবদমান সমস্যাগুলির বিশ্লেষণ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।—

পঞ্চভূতে পাঁচটি ভূতের সমাবেশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত কবি নিজেই কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"জীবনের গতি স্বভাবতঃই রহস্যময়, তাহার মধ্যে অনেক আত্মগুন, অনেক স্বতোবিরোধ, অনেক পূর্বাপরের অসামঞ্জস্য থাকে। কিন্তু লেখনী স্বভাবতঃই একটা সুনির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিতে চাহে। সে সমস্ত বিরোধের মীমাংসা করিয়া, সমস্ত অসামঞ্জস্য সমান করিয়া,—কেবল একটা মোটামুটি রেখা টানিতে পারে।"

"একটা মানুষের মধ্যেই সহস্র বহু ভাগ আছে,—সব-কটাকে সামলাইয়া সংসার চালানো এক বিষম বিপদ।" এ বিপদ কবি ঘাড়ে লইয়াছেন।

"আমরা যতোই ভাবিতেছি, যতোই উপভোগ করিতেছি, ততোই আপনাকে নানাখানা করিয়া তুলিতেছি।" এই যে নিজেকে নানান্-খানা করিতে হয়, তাহাদের মধ্যে মনে মনে বাদ-প্রতিবাদের একটা ধারাবাহিক বিবৃতি প্রবন্ধে সম্ভব হয় না, প্রবন্ধে যেন জজের final judgement শেষ রায়—বাদী-প্রতিবাদীর সওয়াল জবাব, আর উকীল-ব্যারিষ্টারের

যুক্তিতর্ক প্রয়োগ ও খণ্ডন তাহার মধ্যে বেশি থাকে না, থাকে কেবল শেষ নিষ্পত্তি। কিন্তু সেই আপনার নানান্‌খানার মধ্যে যে বাদ-প্রতিবাদ চলে তাহারই বিবৃতির জন্য এই পাঁচটি ভূতের সৃষ্টি, ইহারা যেন মানস-দেহের পঞ্চ উপাদান।

একটা সমস্যার Comprehensive View লইয়া Synthetic কিছু লিখিতে হইলেও সমস্যাকে নানা দিক হইতে দেখার প্রয়োজন। আপনার সঙ্কীর্ণ ও সুনির্দিষ্ট পথ ছাড়িয়া সমস্যাবিশেষকে বিশ্লষণ করিয়া পরীক্ষা করিতে হইলে, সংস্কার-শূন্য ও অপরতন্ত্র ভাবে ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রের অনুবর্তী হইয়া দেখিতে হইলে, নিজত্ব যে একাধিক সত্তায় বিভক্ত হইয়া পড়ে, কবি তাহা অনুভব করিয়াছেন। তাই কবি পঞ্চভূতে নির্মিত মানুষের দৈহিকতাকে পাঁচ ভাগ করিয়া মানসিকতার ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করিয়াছেন। এই পঞ্চভূত-বেষ্টিত "ষড়্‌ভূত" হইতেছে আত্মা—আত্মন্‌—কবি নিজে।

দফাওয়ারি পাঁচ রকম দৃষ্টির ফলাফল বিবৃত করিলে সরস সাহিত্য হয় না—তাহাতে অসুবিধাও আছে—অভ্রান্ত নৈয়ায়িক যুক্তি-পরম্পরা বিন্যাসের ক্লেশ স্বীকার করিয়া সংশ্লেষণে পৌঁছাইতে হয়। একাধিক বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর কথোপকথন তর্ক বিতণ্ডা বাদানুবাদের ছলে বিবৃত করিলে নৈয়ায়িক ক্লেশকে এড়াইয়া সাহিত্যসৃষ্টির সহযোগে সত্যের ইঙ্গিত দেওয়া যাইতে পারে।

যে সকল ধারণা ও চিন্তা মনে স্পষ্ট রূপ ধরে নাই, অথবা

জটিল সংশয়াচ্ছন্ন ও গ্রন্থিল হইয়া আছে, তাহার মূল্য মর্যাদা নির্ণীত হইতে পারে বিশ্লেষণে। পাঁচটি চরিত্রের মুখের আলোচনায় সেই বিশ্লেষণ সম্ভব হইয়াছে।

এ প্রথায় দার্শনিক বৈজ্ঞানিক বা নৈয়ায়িকের যে দায়িত্ব সে দায়িত্ব নাই—একটা অভ্রান্ত সত্যে পৌঁছিবার প্রয়োজন নাই—সত্যানুসন্ধানের ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করিয়া পাঠকের চিন্তাশক্তিকে আলোড়িত করিয়া দিতে পারিলেই মনোবিজ্ঞানের বিশ্লেষণও সাহিত্যরূপ ধারণ করে। পাঁচটি বিভিন্ন প্রকৃতির 'আত্মজে'র দ্বারা কবির এই বিশ্লেষণ সম্ভব হইয়াছে।

হেগেলের মতে চিন্তাসূত্রের সকল synthesis-ই thesis ও antithesis-এর সমন্বয়ে ঘটে। একই মন thesis ও antithesis দুইই জোগায়—দুইয়ের মিলনে যে synthesis তাহা যেন তৃতীয় ব্যক্তির কাজ। Thesis antithesis ও আত্মন্ বা synthesis এই তিনটি ব্যক্তিত্বকে পৃথক পৃথক সত্তা দিয়া বাদানুবাদচ্ছলে চিন্তাকে সুশৃঙ্খলিত করা সত্যানুসন্ধানের একটা পদ্ধতি। অবিমিশ্র নৈয়ায়িক চিন্তার গোষ্ঠীতে রসিকের ঠাঁই নাই। রসদৃষ্টিতেও যে সত্যের সন্ধান মিলে কবি তাহা স্বীকার করেন। সেজন্য রসদৃষ্টিকেও কবি নৈয়ায়িক চিন্তার গোষ্ঠীর মধ্যে আনিয়াছেন। তাহাতে জ্ঞানদৃষ্টির সহিত রসদৃষ্টিরও (thesis antithesis) সম্বন্ধ ঘটিয়া নূতন synthesis-এর প্রয়োজন সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে তিনটি ব্যক্তিত্ব ছয়টি ব্যক্তিত্বে পরিণত হইয়াছে।

এই প্রথা অবলম্বন না করিলে, অর্থাৎ ছয়টি principle-কে ছয়টি জীবনময় ব্যক্তিত্ব দান না করিলে পঞ্চভূত সুসনন্ধ সুবিন্যস্ত চিন্তাধারার শৃঙ্খলার একটা আদর্শ মাত্র হইত, অর্থাৎ ইহার epistemological মূল্য থাকিত—সাহিত্যের আসরে কোনো মূল্য থাকিত না। প্রবন্ধে চিন্তাগতির ধারাবাহিকতায় কেবলমাত্র বিবৃতিতে কল্পনা লীলা ও রসসৃষ্টির অবকাশ নাই, বন্ধুগোষ্ঠীর স্বাধীন অথচ মধুর উদার আবহাওয়ায় পরস্পরের খোলা প্রাণের কথাবার্তায় তাহা সম্ভব হইয়াছে।

তত্ত্বের মনোবিজ্ঞানগত বিশ্লেষণে ভিন্ন ভিন্ন জীবনের রসানুভূতি অভিজ্ঞতা প্রাণের উষ্ণতা উদ্দীপনা যুক্ত হইয়া অভিনব বৈচিত্র্য ও মাধুর্যের সৃষ্টি হইয়াছে। চিন্তাশীলের মনোলোকে যে চিন্তাবৈচিত্র্যের নাট্যাভিনয় চলিতেছে তাহাকে সাহিত্যে প্রকাশ দান করিবার জন্য মনোলোকের চিন্ময় পাত্র-পাত্রীকে কবি পঞ্চভূতের রূপ দান করিয়াছেন।

যে কবিত্ব আলঙ্কারিকতা নাটকীয়তা কৌতুকরসিকতা প্রবন্ধে নৈয়ায়িক ক্রমভঙ্গ ঘটাইয়া দূষণ-স্বরূপ হইত, এ পদ্ধতিতে সেগুলি ভূষণ-স্বরূপ হইয়াছে।

এ প্রথা নূতন নয়। ইহা সক্রেটিস্ প্লেটো হইতে চলিয়া আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' ও 'ঘরে বাইরে'তে এই পদ্ধতি প্রকারান্তরে আসিয়া পড়িয়াছে। Oliver Wendell Holmes-এর Breakfast Table Series-এর মধ্যে আর Landor-এর Imaginary Conversation-এর মধ্যেও এই

রীতি অনুসৃত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন—"শাস্ত্রমতে পঞ্চভূতের সমষ্টিই জগৎ। মানুষও তাই। প্রত্যেক মানুষই প্রায় পাঁচটা মানুষ মিলিয়া। ভিতরেও পাঁচটা, বাহিরেও পাঁচটা।"

যে পাঁচটি ভূতকে কবি গ্রন্থমধ্যে অবতারণ করিয়াছেন কবি নিজেই সেই পাঁচটি ভূতের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। পাঁচটি ভূতের মধ্যেই যখন কবি নিজেই রহিয়াছেন, তখন তাহাদের মধ্যে চরিত্রের ও মনোবৃত্তির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য হয়তো নাই বলিয়া আশঙ্কা হইতে পারে। অন্ততঃ চরিত্রগুলির মধ্যে অতিরিক্ত মাত্রায় অন্তঃসাম্য থাকিতেও পারে। কবি তাই এই বিষয়ে গোড়া হইতেই সতর্ক। অতিরিক্ত মনোভাবের সাম্য থাকিলে অথবা পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে না পারিলে কোনো সমস্যারই বিরোধ বিসংবাদ, বাদ প্রতিবাদ ও সামঞ্জস্যগত নিঃশেষ সমালোচনা যে সম্ভব হইবে না, কবি তাহা বুঝিয়াই গোড়াতেই একটা গৌরচন্দ্রিকা করিয়া লইয়াছেন। তাহাতে এবং গ্রন্থমধ্যে চরিত্রগুলির মনোবৃত্তি ও চিন্তাপ্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য যাহা যাহা দেখাইয়াছেন, তাহার পরিচয় এইরূপ :—

১। ক্ষিতি—জড় ক্ষিতির প্রতীক, তাই সে জড়বাদী, প্রত্যক্ষবাদী, স্থূল সত্যের পক্ষপাতী, সত্যকে ব্যবহারিক জগতে নিয়োগ করিতে চায়, ব্যবহারিকতা দেখিয়া সত্যের মর্যাদা নির্ণয় করে। তাহার মতে সভ্যতার অর্থ অপ্রয়োজনীয়কে

ক্রমবর্জন, আর উন্নতির অর্থ আবশ্যকের সঞ্চয়। সে Materialistic, Opportunist, Utilitarian, অলস Orthodoxy।

২। অপ্—জল যাহাতে জীবনময় হইয়াছে সেই নদীরই প্রতীক ইনি। কাকলীময় কণ্ঠস্বরে লীলায়িত ভঙ্গীতে চরিত্রের তারল্যে ইনি যেমন স্রোতস্বিনীর নারী-রূপ, এক শ্রেণীর মধুর স্বভাব নারীরও তেমন প্রতিনিধি। ইনি ভাবপ্রবণা, অপূর্বতার পক্ষপাতিনী, চঞ্চলা, তরলা, কোমলহৃদয়া, মর্মে মর্মে সুন্দরের পূজারিণী। শিল্পীদের যে মনোভাব ইঁহারও তাহাই। ইনি অন্তরের artistic sense, শিল্পকলার রসানুভূতি। 'মনুষ্য' নামক নিবন্ধে এই চরিত্রটি খুব ভালভাবেই ফুটিয়াছে।

৩। তেজ—তেজের প্রতীক দীপ্তি, তাই তিনি তেজস্বিনী। ইনিও নারী, তাই অন্যতরা নারী স্রোতস্বিনীর সহিত ইঁহার সৌকুমার্য ও মাধুর্যের দিক হইতে মিল আছে। তবু ইঁহার চরিত্রের স্বাতন্ত্র্যও আছে। স্রোতস্বিনীর চরিত্রে রসের প্রাবল্য, দীপ্তিতে জ্ঞানদীপ্তি প্রচুর। স্রোতস্বিনী যুক্তি দিতে জানে না, সে ভালো-লাগাটাকেই সিদ্ধান্তের খুব পাকা ভিত্তি বলিয়া মনে করে। কাহাকেও কিছু বুঝাইতে হইলে যুক্তির বদলে analogy ব্যবহার করে—অনাবশ্যককে সে ভালোবাসে কেবল-মাত্র ভালো লাগে বলিয়া। সে সত্য বিচারে intuition-এর উপরেই নির্ভর করে। দীপ্তি প্রজ্ঞাবতী, তাহার সকল

সিদ্ধান্তের ভিত্তি যুক্তি। অনাবশ্যককে সে ভালোবাসে অনাবশ্যকও রীতিমত আবশ্যক বলিয়া। ব্যবহারিকতার পক্ষপাতীরা অসম্যক ও আত্মকেন্দ্রী দৃষ্টিতে দেখে বলিয়া বহু জিনিসকে তাহাদের অনাবশ্যক মনে হয়—ইহাই হইতেছে দীপ্তির ধারণা। ঐ অসম্যক দৃষ্টিতে দেখার জন্য নারীর প্রতি যুগে যুগে অবিচার হইয়াছে ইহাই তাহার বিশ্বাস। ব্যবহারিক সার্থকতা ও মাধুর্যের মধ্যে সে একটা সামঞ্জস্য করিয়া লইয়াছে। কাণ্ট্ হেগেলের মতধারার সহিত তাহার একটা মিল আছে। নরনারী নিবন্ধে এই চরিত্রটি বেশী ফুটিয়াছে।

৪। বায়ু বা সমীর—বায়ু কল্যাণবাদী। মানুষের সহিত জড়ের সংসর্গে যে বৈজ্ঞানিক কল্যাণের সৃষ্টি হয়, ক্ষিতি তাহাকেই একমাত্র কল্যাণ বলিয়া মনে করে,—আত্মার কথা সে ভাবে না। সমীর আত্মার কল্যাণকেই বড় বলিয়া মনে করে। তাই মানুষের সঙ্গে মানুষের সংসর্গে যে কল্যাণ, সেই কল্যাণই পরম প্রেয় ও শ্রেয়—ইহাই তাহার বিশ্বাস। দীপ্তি ও স্রোতস্বিনী সত্যের সুন্দর রূপের সেবিকা,—সমীর সত্যের শিব রূপের সেবক। জড়বাদের বিরুদ্ধে দুটি তন্ত্র আছে—একটি সৌন্দর্যতন্ত্র (রসতন্ত্রে স্রোতস্বিনী, আর রূপতন্ত্রে দীপ্তি) বা æsthetic school, আর একটি জ্ঞানতন্ত্র বা ভাবতন্ত্র——spiritual school,—সমীর এই Spiritual school-এর ভাবতান্ত্রিক। কল্যাণের অঙ্গীভূত বলিয়া সে সৌন্দর্যেরও

উপাসক। স্রোতস্বিনীর সৌন্দর্যবোধ কতকটা ঐন্দ্রিয়িক (senusous)। সমীরের সৌন্দর্যবোধ spiritual, তাই সে 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' সমস্ত বাহ্য বস্তুকে পুনর্গঠন করিয়া লয়। জড়ের ও নরের সকল কুশ্রীতাকে সে অন্তরের শ্রী দিয়া রম্য করিয়া তোলে—প্রেম যে রসমাধুর্য ও কবিত্বের সংযোগে বিশ্বের সমস্তকেই উপভোগ্য ও কল্যাণময় করিয়া তোলে। সমীরের optimism লক্ষ্য করিবার জিনিস।

৫। ব্যোম—ব্যোম ক্ষিতির মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। ব্যোম অধ্যাত্মবাদী—আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া সে বিশ্ববিচার করে। তাহার কাছে শুধু সৌন্দর্য মাধুর্য কেন, স্বয়ং জড়জগৎ, যাহাকে সকল সৌন্দর্য মাধুর্যের আশ্রয় বলা হয়, তাহাও আত্মারই সৃষ্টি। ব্যোম উর্ণনাভের জালের মধ্যবর্তী উর্ণনাভের সহিত আত্মাকে উপমিত করিয়াছে। এই আধ্যাত্মিকতার জন্য ব্যোম ভারতের প্রাচীন সভ্যতারও পক্ষপাতী, এবং জড়কে যাহারা বড় করিয়া তুলিয়াছে তাহাদের সভ্যতার প্রতি তাহার ঔদাস্য। ব্যোম কখনো cynic, কখনো pessimist, কখনো mystic, কখনো egoist। কিন্তু সকল সময়েই আধ্যাত্মিক। যে জড় মায়াজালে আত্মাকে বন্ধন করিতে চায়, তাহার প্রতি ব্যোমের একটা অশ্রদ্ধা আছে। সেজন্য সে জড়জগৎকে কতকটা ঔদাস্য বা বৈরাগ্যের চোখে দেখে। সৌন্দর্য আত্মারই সৃষ্টি, সংসারিক কল্যাণ জীবের চরম কল্যাণ নহে, প্রেম আত্মার

একটা পাতানো সম্বন্ধ বলিয়া সৌন্দর্য কল্যাণ আর প্রেমের মূল্য ব্যোমের কাছে সমীরের মত নহে। ব্যোম জ্ঞানযোগের পক্ষপাতী হইলেও সে স্বীকার করে যে কর্মযোগ ছাড়া চিত্তশুদ্ধি হয় না বা জ্ঞানযোগের অধিকার জন্মে না। এ বিষয়ে ইনি গীতার মন্ত্রাবলম্বী। কাব্যের তাৎপর্য ও অপূর্ব রামায়ণ নিবন্ধে ব্যোম চরিত্র বিশেষ ভাবে ফুটিয়াছে।

পঞ্চভূতে বর্ণিত চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্ব স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য কবি আগাগোড়াই রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কোথাও যে একেবারে ব্যত্যয় হয় নাই এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ অদ্ভুত রামায়ণের উপসংহারের পংক্তি কয়টি আমরা ক্ষিতির মুখে প্রত্যাশা করি না—সমীরের মুখে প্রত্যাশা করি। আবার 'সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ' প্রবন্ধে ভারতীয় কবির উপমা সম্বন্ধে সমীর যে কথাগুলি বলিয়াছে তাহা ক্ষিতির মুখেই শোভা পায়। তাই ক্ষিতি বিনা প্রতিবাদে সমীরের কথাগুলি মানিয়া লইতে পারিয়াছে।

মতামত প্রচার ও সমস্যাবিচারের দ্বারাই চরিত্রগুলির সম্পূর্ণ মানবিকতা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পাঁচজনের মধ্যে তত্ত্বগত আলাপ আলোচনা ও বাদানুবাদ পাঁচটি গ্রামোফোনের দ্বারাও নিষ্পন্ন হইতে পারিত। কিন্তু কবি প্রত্যেক প্রজ্ঞাময় চরিত্রের অন্তরালে এক একখানি হৃদয়ও সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আগাগোড়া পরস্পরের মধ্যে হৃদয়ের সংযোগও দেখাইয়াছেন

বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে হৃদয়ের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াও সমান্তরাল-ভাবেই প্রতিফলিত হইয়াছে। কেবল চরিত্রগুলির কথোপ-কথনে স্বাভাবিক চলিত ভাষার প্রয়োগ না থাকায় মানবিকতার (Humanism) একটু হানি হইয়াছে। তবে এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে যুগে এই বই লেখা হয় তখন উপন্যাসেও কথোপকথনে কৃত্রিম লেখ্য ভাষাই প্রযুক্ত হইত।